দেড়শো খোকার কাণ্ড

হেমেন্দ্রকুমার রায়

দেড়শো খোকার কাণ্ড

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

কলকাতা যাত্রার আয়োজন

মা কমলা ডাকলেন, খোকন—

বাধা দিয়ে ভারিক্কে চালে গোবিন্দ বললে, আমাকে আর তুমি খোকন বলে ডেকো না মা। মনে রেখো, পরশুদিন আমি দশ বছরে পড়েছি!

কমলা হেসে বললেন, ওরে বাছা, আমার কাছে তুই খোকন থাকবি চিরদিনই।...এখন যা বলি শোন। শিগগির সাবান মেখে চান করে আয়।

সাবানকে গোবিন্দ বরাবরই ভয় করত—পৃথিবীর অন্যান্য খোকদের মতো। ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, চান যেন করছি। কিন্তু সাবান কি না মাখলেই নয়?

কমলা বললেন, সাবান না মাখলে তোর মাসি তোকে নোংরা ছেলে বলে ঘেন্না করবেন। অগত্যা মাথা চুলকোতে চুলকোতে গোবিন্দের প্রস্থান। কমলা আবার সেলাইয়ের কল চালাতে লাগলেন।

একটু পরেই ঘরে ঢুকে পাশে এসে বসলেন, পাড়ার নিস্তারিণী ঠাকরুন। জিজ্ঞাসা করলেন, গোবিন্দ তাহলে আজকেই কলকাতায় যাচ্ছে?

কমলা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ দিদি। আমাকে ছেড়ে খোকনের যেতে ইচ্ছে ছিল না, ওকে একরকম জোর করেই পাঠাতে হচ্ছে। পুজোর ছুটিতে এখানে থেকে করবে কী? আমার ছোটবোন বিমলা আমাদের কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আমি কী করে যাই বলো? পুজোর সময়ে যা কাজের ভিড় দিন রাত খাটি, তবু কাজ ফুরোয় না!

নিস্তারিণী বললেন, কিন্তু গোবিন্দ কি একলা কলকাতায় যেতে পারবে?

কমলা বললেন, তা পারবে না কেন? গোবিন্দ আমার যা চালাক ছেলে! আমি নিজে গিয়ে ওকে ইস্টশানে তুলে দিয়ে আসব। হাওড়ায় ওর মাসির বাড়ি থেকে লোক এসে ওকে নিয়ে যাবে।

নিস্তারিণী বললেন, গোবিন্দ কখনও তো কলকাতায় যায়নি, কলকাতা ওর খুবই ভালো লাগবে! কলকাতা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরই দেখবার শহর। রাত হলেও সেখানে অন্ধকার হয় না! আর মোটরগাড়িগুলো দিন-রাত কী চ্যাঁচায়—মা, মা, মা! কান বলে কালা হয়ে যাই!

এমন সময় গোবিন্দ কোনওরকমে স্নানের কঠিন কর্তব্য সেরে এসে বললে, কলকাতায় কতগুলো মোটর আছে?

—তা কী করে জানব বাছা? তবে দেখলে তো মনে হয় যত মানুষ তত মোটর! বাব্বাঃ! সিধে যমের বাড়ি যাবার গাড়ি!

কমলা বললেন, খোকন, এইবার শোবার ঘরে যাও! সেখানে তোমার সব পোশাক বার করে রেখে এসেছি। ভালো করে মোজা পোরো, জুতার ফিতে বাঁধতে ভুলো না।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অত আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, আমি কচি খোকা নই—এই বলেই গোবিন্দ এক ছুটে অদৃশ্য হল।

নিস্তারিণী বিদায় নিলেন। কমলাও সেলাই ছেড়ে উঠে ভাত বাড়তে গেলেন। খানিক পরে পোশাক পরে এসে গোবিন্দ বললে, আচ্ছা মা, বলতে পারো আমার এই নীল রঙের প্যান্ট-কোট তৈরি করেছে কোন দর্জি?

—কেন বল দেখি?

—তাহলে আমার এয়ার গান ছুড়ে তাকে গুলি করে মেরে ফেলি!

—উঃ, খোকন আমার মস্ত বীর

—ভদ্রলোকেরা কখনও নীল রঙের পোশাক পরে? আমি কি খালাসি?

—নীল রঙের পোশাক পরবার জন্যে কত ছেলে কেঁদে সারা হয়, তোর কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি বাছা? নে, এখন খেতে বোস।

আজ রান্নার কিছু ঘটা ছিল। মাছের ফ্রাই, মুড়ো দিয়ে ডাল, গলদা চিংড়ি দিয়ে ফুলকপির তরকারি, আমের চাটনি, পায়স, সন্দেশ, রসগোল্লা।

গোবিন্দবাবুর দেহটি ছোট্ট হলেও পেটটি বড়ো সামান্য নয়, দেখতে দেখতে সমস্ত খাবার স্বপ্নের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল, অথচ তখনও তার খিদে কমেনি। অন্তত আরও তিন-চারটে রসগোল্লা চাওয়া উচিত কি না, সে যখন মনে মনে এই কথা চিন্তা করছে, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়ল, নীল প্যান্টের ওপরে পায়সের সাদা দাগ! পাছে মা দেখে ফেলেন, সেই ভয়ে চটপট উঠে পড়ল।

মা তখন অন্য কথা ভাবছেন। বললেন, খোকন, কলকাতায় পৌঁছেই আমাকে চিঠি লিখতে ভুলো না।

হাত দিয়ে টুক করে পায়সের দাগটা মুছে ফেলে গোবিন্দ বললে, হ্যাঁ, চিঠি লিখব বইকী মা।

—খুব সাবধানে থেকে বাছা! কলকাতা আমাদের কালীপুরের মতন ঠাঁই নয়। তারপর সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো, আমাকে যেমন জ্বালাও তেমন যেন জ্বালিয়ো না।

গম্ভীর স্বরে গোবিন্দ বললে, স্বীকার করছি, আমি খুব ভালো ছেলের মতন থাকব।

ছেলেকে নিয়ে কমলা আবার শোবার ঘরে ফিরে এলেন। বাক্স খুলে কখানা নোট বার করে গুনে বললেন, খোকন, এই একখানা একশো টাকার আর দুখানা দশ টাকার নোট তোমার দিদিমাকে দিয়ো। মাকে বোলো, এ-বছর পুজোর সময়ে এর বেশি আর কিছু দিতে পারলুম না। আর এই পাঁচ টাকার নোটখানা হচ্ছে তোমার জন্যে। কিছু নিজে খরচ কোরো, বাকি আসবার সময়ে রেলভাড়া দিয়ো। এই দ্যাখো, নোটগুলো আমি খামের ভেতরে পুরে দিলুম। নাও, সাবধানে রাখো।

গোবিন্দ অল্পক্ষণ ভাবলে। তারপর খামখানা নিয়ে কোটের ভিতরকার পকেটে রেখে বললে, ব্যাস! নোটের পা নেই, পকেট থেকে আর বেরিয়ে পড়তে পারবে না!

কমলা বললেন, দ্যাখো, রেলগাড়িতে কারুর কাছে বোলো না যেন, তোমার পকেটে এত টাকা আছে!

গোবিন্দ আহত স্বরে বললে, তুমি কি ভাবে মা, আমি এতই বোকা? জানো, আমি দশ বছরে পড়েছি?

কমলা বললেন, তবু সাবধানের মার নেই!

তোমাদের মধ্যে যারা বড়োলোকের ছেলে, তারা হয়তো ভাবতে পারো, মোটে একশো পঁচিশ টাকার জন্যে কমলা এতবেশি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? যাদের পাঁচ-সাত লাখ টাকা আছে তাদের কাছে হয়তো একশো-দেড়শো টাকা এমন কিছুই নয়, কিন্তু গোবিন্দের মা যে বড়ো গরিব!

গোবিন্দের বয়স যখন তিন বছর, তখনই তার বাবা মারা যান। সেইদিন থেকেই ছেলে মানুষ করবার ভার পড়ে এই অসহায়া বিধবার উপরে। কালীপুর গ্রামে নিজের বসতবাড়ির একতলায় কমলা একটি ছোটো ইশকুল খুলেছেন, পাড়ার ছোটো ছোটো মেয়েরা সেখানে লেখাপড়া করতে আসে। তাদের কাছ থেকে সামান্য যে মাহিনা পান, তাতে তার সংসার চলে না। কাজেই পাড়ার লোকের জামা প্রভৃতি তৈরী করে দিয়ে তাঁকে আরও কিছু রোজগার করতে হয়। এই আয় থেকেই তিনি কোনওরকমে সংসারের খাই-খরচ চালান, গোবিন্দের ইশকুলের মাহিনা ও পুথিপত্র কেনবার খরচ দেন, নিজের বুড়ি মাকেও বছরে বছরে কিছুসাহায্য করেন। গোবিন্দও বড়ো ভালো ছেলে। মাকে সে যেমন ভক্তি করে, তেমনি ভালোবাসে। মায়ের খাটুনি কমাবার জন্যে সে খেলাধুলো ফেলে সংসারের নানান কাজ করে.নিজের হাতে। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, গোবিন্দ তরি-তরকারি কোটা থেকে রান্নাবান্না পর্যন্ত অনেক কাজই শিখে ফেলেছে।.

কমলা বললেন, এই ব্যাগটার ভেতরে তোমার জামা-কাপড় রইল। ব্যাগটা যদি বেশি ভারী মনে হয়, তাহলে মুটে ডেকো।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে গোবিন্দ বললে, না, আমি মুটে ডাকব না! তোমার গোবিন্দ আর খোকা নয়?

কমলা বললেন, তোমার মাসি ভারী ফুল ভালবাসেন! বাগান থেকে তাই আমি গোলাপ আর রজনীগন্ধা কাগজে মুড়ে রেখেছি। এগুলো মাসিকে দিয়ো।

ফুলগুলি আর-একহাতে নিয়ে গোবিন্দ বললে, ঘড়িতে কটা বাজল দাখো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই কমলা ব্যস্ত স্বরে বলে উঠলেন, ওমা, নটা বাজে যে! গাড়ি ছাড়বে সাড়ে নটায়! চলো চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি?

—মা, এই আমি 'কুইক মার্চ' আরম্ভ করলুম!

যাত্রা

মায়ের সঙ্গে পালকিতে চড়ে গোবিন্দ স্টেশনে গিয়ে নামল।

দেখা গেল, স্টেশনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে নটবর ওঝা। এয়া ভুঁড়ি, এয়া গোঁফদাড়ি, হাতে এয়া মস্ত লাঠি! সে হচ্ছে গাঁয়ের একজন চৌকিদার।

নটবর বললে, কী গো মা-ঠাকরেন, ছেলেকে সাহেব সাজিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছ? বিলেতে নাকি?

++++++++++++++++++++++++++

কমলা বললেন, না গো নটবর, খোকন যাচ্ছে কলকাতায় বেড়াতে।

কিন্তু গোবিন্দ তখন নটবরকে দেখছিল না, দেখছিল রাশি রাশি সর্ষেফুল! এই কাল বৈকালেই সে যখন হেবো, ভুতো, মোনার সঙ্গে মুখুয্যেদের বাগানে পেয়ারাগাছে উঠে পাকা পেয়ারা লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল, তখন নটবর হঠাৎ এসে পড়েছিল সেখানে। অবশ্য তারা সবাই এক এক লাফে বানরের মতো ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে, হরিণের মতো বেগে ছুটে লম্বা দিতে দেরি করেনি বটে, কিন্তু তবু তার বিশ্বাস, নটবর তাকে ঠিক চিনে ফেলেছিল! এখন কী হবে? নটবর যদি তাকে ধরে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়?

ভাগ্যে নটবর তখন আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেল!

গোবিন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললে, নটবর এখন কিছু করলে না বটে, কিন্তু আমি ফিরে এলেই নিশ্চয় আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

স্টেশনে ঢুকে কমলা বললেন, খোকন, তুমি ততক্ষণ গাড়িতে গিয়ে উঠে বসো, আমি টিকিট কিনে আনি। ব্যাগটা যদি গাড়িতে নিজে না তুলতে পারো, আর কারুকে তুলে দিতে বোলো!

—ভারী তো ব্যাগ! আমি খোকা নই। তুমি টিকিট কিনে আনো, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

টিকিট কিনে এনে কমলা বললেন, দ্যাখো খোকন, হাওড়ার ইষ্টিশানে যেন হারিয়ে যেয়ো না!

এইবারে গোবিদের রাগ হল। বললে, মা, তুমি বড় বেশি গিন্নিপনা করছ! একশোবার বলছি, আমি খোকাও নই বোকাও নই! হারাব কি বলো? আমি কি সিকি পয়সার মতো ছোটো?

আর টাকা সাবধান?

গোবিন্দ পকেটের উপরে হাত রেখে অনুভবে বুঝলে, টাকা আছে যথাস্থানেই। বললে, মা, তোমার টাকা সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। এখন গাড়ির দিকে চলো।

দুজনে পায়ে পায়ে এগুলো। গোবিন্দ বললে, মা, পুজোর সময়ে সারা দিন তুমি অত খেটো না। আমি চললুম, বাড়িতে তোমাকে দেখবার লোক কেউ রইল না। দ্যাখো, অসুখ করে না যেন। ভয় নেই, দরকার হলে আমি এরোপ্লেনে চড়ে হুস করে তোমার কাছে এসে পড়ব। সে আদর করে মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল।

কমলা বললেন, তোর মাসতুতো বোন নমিতা বোধহয় তার সাইকেলে চড়ে তোকে ইস্টিশন থেকে নিয়ে যেতে আসবে।

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বললে, মেয়ে আবার সাইকেলে চড়ে নাকি?

কমলা বললেন, তোর মেশোমশায়ের ছেলে হয়নি কিনা, তাই মেয়ের কোন আবদারেই 'না' বলতে পারেন না। নমুর আবার ভারী গোঁ, যা ধরে ছাড়ে না। তোর মেশো তাকে ঠিক বেটাছেলের মতনই মানুষ করেছেন।

—নমিতার বয়স কত?

—তোর চেয়ে এক বছরের ছোটো। খুব ছেলেবেলায় তোরা একসঙ্গে খেলা করেছিস। এখন বোধহয় তোরা কেউ কারুকে দেখলে চিনতে পারবি না।

ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

—খোকন, দেখো বাছা যেন ভুল করে কোনও আগের ইস্টিশানে নেমে পোড়ো না?

—আচ্ছা।

—হাওড়ায় তোমাকে নিতে লোক আসবে।

—আচ্ছা গো আচ্ছা।

—কারুর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।

—হুঁ।

—রোজ সাবান মেখে চান কোরো!

—হুঁ।

—হারিয়ে যেয়ো না।

—না।

—চিঠি লিখো।

—তুমিও লিখো।

এইভাবে কথাবার্তা চলত বোধহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু স্টেশনের ঘণ্টা আর সময় দিলে না। ঢং ঢং ঢং করে সে বেজে উঠল, গোবিন্দও গাড়িতে উঠে পড়ল।

—দুর্গা, দুর্গা।... খোকনমণি!

—মা!

গোবিন্দ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মায়ের গালে চুমু খেলে।

মা চুপিচুপি বললেন, টাকা সাবধান!

—ভয় নেই মা, টাকা ঘুমুচ্ছে?

গার্ড নিশান নাড়তে লাগল। ইঞ্জিন বাঁশি বাজালে। গাড়ি চলতে শুরু করলে।

গাড়ির জানলায় গোবিন্দের এবং প্লাটফর্মে কমলার চোখ করছে ছল ছল। দেখতে দেখতে গোবিন্দকে নিয়ে ট্রেনখানা যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল! কমলার চোখ উপচে দুই গাল বয়ে তখন জল পড়ছে। গোবিন্দ ছাড়া তার যে নিজের বলতে আর কেউ নেই!

কামরার ভিতরে

জানলার দিকে পিছন ফিরে গোবিন্দ সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলে। কামরার এক ভদ্রলোক আর সবাইকে বললেন, বাঃ ছেলেটি তো খাস দেখছি! আজকালকর ছেলেরা এমন নম্র হয় না। আমার নিজের ছেলেগুলো তো পাজির পা ঝাড়া।

কালীপুরের বিষ্ণু চক্রবর্তী সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন, তিনি নামবেন পরের স্টেশনে। চক্রবর্তী বললেন, গোবিন্দ হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের সেরা ছেলে।

গোবিন্দ বুকের কাছে জামার উপরে হাত দিলে। পকেটের ভিতরে নোটগুলো খড়মড় করে উঠল। তখন সে খুশি হয়ে আসনের উপরে ভালো করে জাঁকিয়ে বসল।

একবার প্রত্যেক আরোহীর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। কারুকেই দেখে চোর, গীটকাটা বা হত্যাকারী বলে মনে হল না। এক কোণে একটি মহিলা বসে কোলের ছেলের কান্না থামাবার চেষ্টা করছেন। একজন ছোট্টখাট্ট রোগা ভদ্রলোক মস্তবড়ো ও মোটা বর্মা চুরট টানছেন। আর একটি লোক অন্য কোণে বসে নিজের মনে খবরের কাগজ পড়ছে। তার মাথায় গান্ধি-টুপি।

হঠাৎ সে খবরের কাগজখানা নামিয়ে পাশে রাখলে। পকেট থেকে গুটি-চারেক চকোলেট বার করে গোবিন্দের হাতে গুজে দিয়ে বললে, এই নাও খোকাবাবু, চকোলেট খাও।

গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আমার নাম খোকাবাবু নয়—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়?

কামরার সবাই হেসে উঠল। লোকটাও হেসে বললে, নমস্কার গোবিন্দবাবু। পরিচয় পেয়ে খুশি হলুম। আমার নাম জটাধর। —কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—দেখলেন তো, কালীপুর থেকে।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—কলকাতায়। বলেই গোবিন্দ আর একবার টাকার পকেটে হাত দিলে। নোট বললে, 'খড়মড় খড়মড়!' গোবিন্দ মনে মনে বললে —বহুৎ আচ্ছা।

—এর আগে কলকাতায় গিয়েছ?

—না!

জটাধর আরও এগিয়ে তার পাশে বসে বললে, তাহলে কলকাতা দেখে তোমার পেটের পিলে চমকে যাবে। কলকাতার এক-একখানা বাড়ি একশো তলা উঁচু। পাছে তারা ঝড়ে হেলে পড়ে যায়, সেই ভয়ে তাদের আকাশের সঙ্গে শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।.ওখানে কারুর যদি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি যাবার দরকার থাকে, তাহলে তাকে প্যাক করে ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়া হয়...ওখানে কারুর যদি এক হাজার টাকা ধার করবার ইচ্ছা হয়, তাহলে সে ব্যাংকে গিয়ে নিজের মস্তিষ্ক ব্যাংকের জিম্মায় বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে আসে.ওখানে—

যিনি বর্মা চুরট টানছিলেন তিনি হঠাৎ বাঁধা দিয়ে বললেন, মশাইয়ের মস্তিষ্কবোধহয় এখন ব্যাংকের জিম্মায় বাঁধা আছে? আজগুবি যা তা বলে ছেলেমানুষকে এমন ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

তখন বর্মা চুরটের সঙ্গে গান্ধি-টুপির এমন জোর তর্ক লেগে গেল যে, ও-কোণ থেকে কাঁদুনে খোকাটাও ভয়ে কান্না থামিয়ে ফেললে।

গোবিন্দ কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করলে না। এই খানিকক্ষণ সে একপেট খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু আবার তার খিদে পেল। মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটা বার করে সে খেতে বসল লুচি ও আলুর দম।

ইতিমধ্যে ট্রেনখানা একটা বড়ো স্টেশনে এসে থামল। গোবিন্দ কিন্তু সেদিকে চেয়েও দেখল না; কারণ সে তখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে, লুচির থাকের তলায় রয়েছে দুটো বড়ো বড়ো সিদ্ধ হাঁসের ডিম!

দশখানা লুচি, আটটা আলুর দম এবং দুটো ডিম সাবাড় করবার পর গোবিন্দ আবার মুখ তুলে চারিদিকে তাকাবার সময় পেলে একী, কামরার ভিতরে গান্ধি-টুপি ছাড়া আর কারুকেই দেখা যাচ্ছে না যে! ওই বড়ো স্টেশনে সবাই নেমে গিয়েছে নাকি?

ট্রেন ফের চলতে শুরু করলে। কামরায় আছে খালি সে আর জটাধর। গোবিন্দের এটা ভালো লাগল না। সে অজানা লোক অচেনা ছেলেকে চকোলেট খেতে দেয় আর অদ্ভূত গল্প বলে, আর যার নাম জটাধর, তাকে তার পছন্দ হয় না।

গোবিন্দ ভাবলে, আর একবার পকেটে হাত নিয়ে দেখব নাকি? ...না বাবা, খালি-খালি পকেটে হাত দিচ্ছি দেখে জটাধর যদি কোনও সন্দেহ করে? তার চেয়ে মুখ ধোবার ঘরে যাই। তাই গেল। পকেট থেকে খামখানা বার করলে এবং খাম থেকে বার করলে নোটগুলো। গুনে দেখলে, ঠিক আছে। ভাবলে, নোটগুলো কি আরও ভালো করে রাখা যায় না?

হঠাৎ গোবিদের মনে পড়ল, স্টেশনের প্লাটফর্মে সে একটা সবচেয়ে বড়ো আলপিন কুড়িয়ে পেয়েছে। সেই আলপিনে নোটের সঙ্গে খামখানা গেঁথে সে জামার সঙ্গে আটকে রাখলে। হুঁ, এখন আর কিছু ভয় নেই! গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় ফিরে গেল। জটাধর তখন মুখের উপরে খবরের কাগজখানা চাপা দিয়ে হেলে পড়েছে এবং তার নাক ডাকছে ঘড়-ঘড়ঘড়-ঘড় করে। আঃ বাঁচা গেল বাবা, লোকটার সঙ্গে আর আজেবাজে বকে মরতে হল না—এই ভেবে সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে।

বাহবা, কী মজা! মস্ত মস্ত গাছ, বড়ো বড়ো ঝোপ, পানা-ভরা পুকুর, হেলে-পড়া কুঁড়েঘর, লাঙল-ঠেলা চাষা—সব আসছে আর যাচ্ছে যেন বেগে ঘুরন্ত গ্রামোফোনের রেকর্ডের উপর চড়ে! মাটি ছুটছে, গ্রাম ছুটছে, অরণ্য ছুটছে—ছুটছে না খালি আকাশ, আর তাদের গাড়িখানা! কিন্তু এসব ছুটোছুটি আর কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়? গোবিন্দ চোখ ফিরিয়ে নিলে।

ওরে বাবা-রে বাবা, জটাধরের ওই মোটা নাকের ভিতরে কি ঝোড়ো-হাওয়া বাসা বেঁধেছে, না ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে বাজের বাচ্ছা! অত বেশি নাক ডাকাই বা কতক্ষণ ধরে শোনা যায়?

গোবিন্দের ইচ্ছে হল, কামরার মধ্যেই খানিক চলে-ফিরে বেড়াতে। তারপরেই সে ভাবল, তার পায়ের শব্দে যদি জটাধরের ঘুম ভেঙে যায়! বেড়ানো হল না। সে বসে বসে জটাধরের মুখখানা ভালো করে দেখতে লাগল।

লম্বাটে ঘোড়ার মতন মুখ-বিচ্ছিরি! কান দুটো যেন তেড়ে-মেড়ে মুখ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে! আমরি মরি, ওই মুখে আবার শখ করে রাখা হয়েছে প্রজাপতি-গোঁফ! ঠোঁটদুখানা কি পুরু-রে বাবা! ও মুখে গান্ধি-টুপি মানায় না। জটাধর গান্ধি-টুপি পরেছে কেন? ইস! গোবিন্দ ভারী চমকে উঠল! সে যে আর একটু হলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল! ...না, কিছুতেই ঘুমনো-টুমনো চলবে না! আহা, গাড়িতে এখন যদি আর কোনও যাত্রী আসে তাহলে বড়ো ভালো হয়। ট্রেন আরও কয়েকটা স্টেশনে থামল, কিন্তু গোবিন্দের দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোনও নতুন যাত্রী সেই কামরায় উঠল না।

আরে মোলো, আবার যে ঘুম পায়! গোবিন্দ নিজের পায়ে চিমটি কাটতে লাগল। তাদের কেলাসে যখন আঁকের মাস্টার কৈলাসবাবু সবিস্তারে অঙ্কশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে বসতেন, তখন এই উপায়েই গোবিন্দ ঘুমের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত।

উপায়টা এখানেও কিছুক্ষণ কাজে লাগল। যেমন ঢুলুনি আসে, অমনি পায়ে চিমটি কাটা! ঘুম তো ঘুম, চিমটির কাছে ঘুমের বাবাও এগুতে রাজি নন! গোবিন্দ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আচ্ছা, ঘুমেরও কি বাবা আছে? তার নাম কী?

...আচ্ছা, তার মাসতুতো বোন নমিতাকে দেখতে কেমন? মোটা, না ছিপছিপে? বেঁটে, না ঢাঙা? মা বললেন, তার সঙ্গে আমি নাকি ছেলেবেলায় খেলা করেছি! কিন্তু তার মুখ আমার মনে হচ্ছে না তো। তবে একটা কথা আমি ভুলিনি। নমিতা আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে চেয়েছিল! এক ফোট্টা একটা মেয়ে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে কুস্তি লড়তে চায়! একটা ল্যাং মারলে কোথায় ঠিকরে পড়ত তার ঠিক নেই। ধ্যাত? আমি লড়তে রাজি হইনি।

ইস! এবারে যে ঢুলে বেঞ্চি থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছিলুম! চিমটি কেটে কেটে পায়ে কালশিরে পড়ে গেল, তবু ঘুম ছাড়ে না যে!...না, আর এক কাজ করি। জামার বোতামগুলো গুনে দেখা যাক!—কী আশ্চর্য ওপর থেকে নীচের দিকে গুনে দেখছি, চারটি বোতাম। কিন্তু নীচে থেকে ওপর দিকে গুনলে হচ্ছে পাঁচটা। এর মানে কী?

মানে বোঝা হল না। এবারে গোবিদের দুই চোখের উপরে ভেঙে পড়ল যেন ঘুমের পাহাড়! গোবিন্দ একেবারে কাত!

গোবিন্দের স্বপ্নদর্শন

আচম্বিতে গোবিন্দ দেখলে, ছেলেবেলাকার খেলাঘরের রেলগাড়ির মতন এ ট্রেনখানাও চাকার মতন গোল হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছুটে চলেছে।

সে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সবাই যেন গিয়েছে উলটেপালটে। মণ্ডলটা ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে, ইঞ্জিনটা ওদিক দিয়ে ফিরে ক্রমেই গার্ডসায়েবের শেষ-গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে! কুকুর যেমন গোল হয়ে নিজের ল্যাজ কামড়াবার চেষ্টা করে, এ ট্রেনখানাও যেন তাই করতে চায়। আর এই মণ্ডলের মধ্যে রয়েছে নানান জাতের গাছ আর মস্ত একটা কাচের ঘর আর হাজার হাজার জানলাওয়ালা একখানা দুশো তলা বাড়ি।

গোবিন্দের জানতে সাধ হল, এখন ঘড়িতে কটা বেজেছে। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করলে প্রকাণ্ড এক ঘড়ি, যেটা টাঙানো থাকে তাদের বৈঠকখানার দেওয়ালে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লেখা রয়েছে, গাড়ি দৌড়াচ্ছে ঘণ্টায় দুশো পাঁচ মাইল। কামরার মেঝেয় থুতু ফেললে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

সে আবার বাইরের দিকে তাকালে। ইঞ্জিন ট্রেনের শেষ-গাড়িখানা ধরে ফেললে বলে। গোবিন্দের বেজায় ভয় হল। ইঞ্জিনে আর শেষগাড়িতে যদি ঠোকাঠুকি হয়, তাহলে মস্ত একটা রেল-দুর্ঘটনা হবে। হ্যাঁ, এ-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। তার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।

গোবিন্দ আস্তে আস্তে নিজের কামরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারপর ট্রেনের পাদানিতে নেমে সন্তর্পণে এগুতে লাগল। হয়তো গাড়ির ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে! এগুতে এগুতে প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে দেখলে, সারা গড়ির ভিতরে সেই গন্ধি টুপি-পরা জটাধর ছাড়া আর একজনও আরোহী নেই।

জটাধরের টুপিটাও ভারী মজার তো! ওটা যে দস্তুরমতো চকোলেট দিয়ে গড়া! জটাধর টুপির খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর একগাল হেসে বললেন, গোবিন্দবাবু, আপনিও একটু খাবেন নাকি?

গোবিন্দ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, টুপি-চকোলেট আমি খাই না...ওদিকে চেয়ে দেখুন ইঞ্জিনের কাণ্ড-কারখানা।

জটাধর হো হো করে হেসে উঠে টুপির আরও খানিকটা ভেঙে খেয়ে ফেললে। তারপর নিজের ভুঁড়ির উপরে চাপড় মেরে বললে, গোবিন্দবাবু, খাসা খেতে!

গোবিন্দের গা বমি বমি করতে লাগল। সে পাদানি ধরে বরাবর এগিয়ে ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে দেখলে, না ড্রাইভার ঘুমোয়নি— ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানের সিটে পা বুলিয়ে বসে বসে টপ্পা গান গাইছে।

গোবিন্দকে দেখেই সে চাবুক তুলে এমনভাবে লাগাম টেনে ধরলে, যেন এই রেলগাড়িখানা টানছে ঘোড়ারাই!

হ্যাঁ, তাই তো! রেলগাড়িখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা-দুটো নয়, এগারোটা ঘোড়া। তাদের পায়ে পায়ে বাধা রয়েছে রুপোর স্কেট, আর ছুটতে ছুটতে তারা গানের সুরে বলছে— যাব নাকি আমরা— যাব নাকি আমরা, এই সোনার দেশ ছেড়ে ওগো, সোনার দেশ ছেড়ে?

গোবিন্দ কোচম্যানের গা ধরে জোরে নাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, শিগগির তোমার ঘোড়াগুলোকে থামাও, নইলে এখুনি রেল-দুর্ঘটনা হবে। তারপরেই সে চিনতে পারলে, ও বাবা, এ কোচম্যান তো যে-সে লোক নয়, এ যে চৌকিদার নটবর ওঝা!

নটবর কটমট করে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, মুখুয্যেদের পেয়ারা চুরি করেছিল কে?

গোবিন্দ বললে, আমি।

—সঙ্গে আর কে কে ছিল?

—বলব না।

—বলবে না! বটে? তাহলে আমরা এমনি চাকার মতন গোল হয়ে ঘুরবই! বলেই চৌকিদার নটবর ওঝা চাবুক তুলে ছপাৎ-ছপাৎ করে ঘোড়াগুলোকে মারতে শুরু করে দিলে এবং তারাও চমকে উঠে পাই পাই করে এমন দৌড় মারলে যে, ইঞ্জিনখানা আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গার্ডের গাড়িকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।... আরে আরে, শেষ-গাড়ির ছাদে বসে আছে ও কে? ও-যে আমাদের নিস্তারিণী ঠাকরুণ! ঘোড়াগুলো তাকে দেখে বড়ো বড়ো দাঁত কিড়-মিড় করছে, আর ঘোড়ার কামড় খাবার ভয়ে কেঁপে কেঁপেই নিস্তারিণী ঠাকরুণের প্রাণটা যায় বুঝি!

গোবিন্দ বললে, নটবর, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাকে দশ টাকা বকশিশ দেব!

পাগলের মতো ঘোড়াদের চাবকাতে চাবকাতে নটবর হুমকি দিয়ে বললে, চুপ কর ছোকরা, অত বাজে বকতে হবে না!

গোবিন্দ আর সইতে পারলে না, ট্রেন থেকে মারলে এক লাফ! গোনা কুড়িটা ডিগবাজি খেয়ে সে লাইনের ঢালু জমি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে নেমে গেল। তারপর উঠে ফিরে দেখে, রেলগাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগারোটা ঘোড়া মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। আবার চলল চৌকিদার নটবরের চাবুক এবং সঙ্গে সঙ্গে হেঁড়ে গলার হাঁক— ধর, ধর, ছোড়াকে ধর?

ঘোড়াগুলো অমনি রেলগাড়ি নিয়ে লাইন ছেড়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে গোবিন্দকে ধরতে এল। রেলগাড়িখানাও ক্রমাগত লাফ মারতে লাগল রবারের বলের মতো।

এর পর কী করা উচিত তা নিয়ে গোবিন্দ মাথা ঘামালে না মোটেই। দৌড়তে লাগল সে যত-জোরে পারে,— পেরিয়ে গেল একটা ময়দান, পেরিয়ে

গেল একটা জঙ্গল, পেরিয়ে গেল একটা নদী। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায় আর দেখে, ঘোড়ায়-টানা ট্রেনও তেড়ে আসছে হুড়মুড় করে! সামনে তার যত গাছ-টাছ পড়ছে ভেঙে গুড়ো হয়ে যাচ্ছে— মাঠের উপরে দাঁড়িয়ে রইল খালি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, আর তার একটা ডালে ঝুলতে ঝুলতে আর কাঁদতে কাঁদতে ক্রমাগত দুই পা ছুড়ছেন আমাদের নিস্তারিণী ঠাকরুন।

সামনেই সেই দুশো তলা বাড়ি। জানলা যার হাজার হাজার। গোবিন্দ সুমুখের একটা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল আর পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল বাইরে।ট্রেনও তাই করলে! তখন গোবিন্দের কী ঘুমই যে পেয়েছে! কিন্তু এখন হাত-পা আরামে ছড়িয়ে একটু চোখ বোজবার জো কি আছে, ট্রেন যে নাছোড়বান্দা! বাড়ির ভিতর দিয়ে এগারোটা ঘোড়া আর রেলগাড়িগুলো ছুটে আসছে টগবগ টগবগ ঝম ঝম ঝম ঝম! মস্ত বাড়ির গা বয়ে একখানা লোহার মই উঠে গেছে একেবারে সোজা ছাদ পর্যন্ত। গোবিন্দ তড় তড় করে মই বয়ে উপরে উঠতে লাগল। ভাগ্যে সে জিমনাস্টিকে পাকা। নইলে এই বেয়াড়া মই বয়ে কি ওঠা যায়! এক, দুই, দিন, চার করে গুনতে গুনতে সে উপরে উঠছে! পঞ্চাশ তলা পর্যন্ত উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে, মাঠ-নদী পড়ে রয়েছে কত নীচে— গাছপালাগুলো দেখাচ্ছে কত ছোটো ছোটো! ও বাবা, দফা সারলে বুঝি! ঘোড়ায়-টানা রেলগাড়িখানাও যে মই বয়ে উপরে উঠছে। খটখট খটখট বেজে বেজে উঠছে মইয়ের ধাপগুলো! ট্রেনের কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না, মইখানা যেন তারই নিজস্ব রেললাইন!

গোবিন্দও উপরে উঠেছে—আরও, আরও উপরে! এই তো একশো তলা.এই তো একশো কুড়ি তলা!..একশো চল্লিশ তলা.....একশো ষাট...একশো আশি...একশো নব্বই...দুশো তলা! যাঃ, মই ফুরুল। ছাদের উপরে দাড়িয়ে গোবিন্দ ভাবছে, এখন উপায়? ঘোড়াদের খুরের, রেলগাড়ির চাকার শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে যে!

গোবিন্দ ছাদের ধারে গেল। পকেট থেকে রুমালখানা বার করে মাথার উপরে দুই হাত বিছিয়ে ধরলে। তারপর সেই রুমাল-প্যারাসুট ধরে দিল এক লম্ফ। ট্রেন ছাদে উঠেও তাকে ধরতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। আর বিষম হুড়মুড়নি শুনতে শুনতে গোবিন্দ নামছে পৃথিবীর মাটির দিকে— তারপর আর কিছু শোনা কি দেখা যায় না।

তারপর—দড়াম! গোবিন্দ মাঠের উপরে এসে পড়ল। খানিকক্ষণ ধরে হাঁফ ছাড়লে দুই চোখ বুজে। তার মনে হল, সে যেন ভারী একটা মিষ্টি স্বপন দেখছে।

তারপুর চোখ খুললে। এবং সেইখানেই চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে পেলে দুশো তলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত।

দেখলে, ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এগারোটা ঘোড়া নিজেদের মাথার উপরে খুলে ধরলে এক একটা ছাতা। চৌকিদার নটবরও ছাতার বাঁট নেড়ে ঘোড়াদের গোজা দিতে লাগল। ঘোড়ারা আর ইতস্তত না করে ছাতা ধরে ট্রেন টেনে লাফিয়ে পড়ল নীচে দিকের। ট্রেন যত নীচে নামছে দেখতে হয়ে উঠছে তত বড়ো।

গোবিন্দ হাঁক-পাঁক করে উঠে পড়ল। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়। এবারে সে ছুটছে সেই কাচের ঘরখানার দিকে। কাচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাহির থেকেই দেখা গেল, ঘরের মধ্যে বসে সেলাইয়ের কল চালাতে চালাতে তার মা গল্প করছেন নিস্তারিণী ঠাকরুনের সঙ্গে। আঃ, বাঁচা গেল! মা রয়েছেন আর ভয় কি?

এক ছুটে ভিতরে গিয়ে বললে, মা, মা, এখন আমি কী করব?

কমলা বললেন, কেন, কী হয়েছে?

—দেওয়ালের ভেতর দিয়ে চেয়ে দ্যাখো!

কমলা দেখলেন, একখানা ঘোড়ায়-টানা রেলগাড়ি বোঁ বোঁ করে তেড়ে আসছে কাচের ঘরের দিকে।

তিনি সবিস্ময়ে বললেন, ওমা, কি হবে! নটবর চৌকিদার চালাচ্ছে রেলের গাড়ি?

গোবিন্দ বলল, নটবর অনেকক্ষণ ধরে আমাকে তাড়া করছে!

—কেন?

—মুখুয্যেদের পেয়ারা গাছে উঠে আমি পেয়ারা পেড়েছিলুম বলে।

—বেশ করেছিলে। পেয়ারা গাছে না উঠলে কেউ কখনও পেয়ারা পাড়তে পারে?

—কেবল তাই নয় মা। নটবর জানতে চায়, আমার সঙ্গে আরও কে কে ছিল? তা আমি বলব কেন? সেটা নীচতা হবে যে!

নিস্তারিণী বললেন, নটবর হচ্ছে বদমাইসের ধাড়ি। কমলা, সেলাইয়ের কলটা ভালো করে টিপে দাও তো, দেখি নোটাে মুখপোড়া কেমন করে আমাদের ধরে।

কমলা ভালো করে কল টিপলেন। অমনি সেই কাচের ঘরখানা বন বন করে ঘুরতে শুরু করলে। তার দেওয়ালে দেওয়ালে সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ে সৃষ্টি করলে যেন লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের ফুলঝুরি! এখন তার দিকে তাকালেও চোখ ঝলসে অন্ধ হয়ে যায়!

এগারোটা ঘোড়া চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাক ছাড়লে— চিহি চিহি, চিহি, চিহি, চিহি, চিহি! ভয়ে তাদের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তারা আর এক পা এগুতে নারাজ।

নটবর রেগে চাবুক চালাতে চালাতে চ্যাঁচালে, ড্যাম, রাসকেল, গাধা, ঘোড়া! ছোট বলছি!

এবারও ঘোড়া ছুটল না। নিস্তারিণী একগাল হেসে মিশি-মাখা কালো দাঁত বার করে বললেন, এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন জব্দ!

গোবিন্দ ফুর্তি-ভরে হাততালি দিয়ে বললে, কী মজা রে, কী মজা! মা, তুমি এখানে আছ জানলে আমি কি আর ওই কিস্তুতকিমাকার ঢাঙা বাড়িখানার ছাদে গিয়ে উঠতুম?

ঘোড়ারা এবারে আর রাশ মামলে না, ফিরে নটবরকে নিয়ে আবার রেল-লাইনের দিকে দিলে চম্পট! নিষ্ফল আক্রোশে নটবর-চৌকিদারের চাবুক আছড়াতে আছড়াতে ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

গোবিন্দ চেঁচিয়ে বললে, ও নটবর! তোমার বড় খাটুনি হল। খিদে পেয়ে থাকে তো একটা পেয়ারা খেয়ে যাও।

কমলা বললেন, খোকন, তোমার জামা-টামা ছিড়ে যায়নি তো?

না, মা।

—আর সেই নোটগুলো? সেগুলো সাবধানে রেখেছ তো?

গোবিন্দের বুকের কাছটা ছাৎ করে উঠল। মাথা ঘুরে সে পড়ে গেল এবং— এবং তারপর জেগে উঠল।

গোবিন্দের লিলুয়ায় অবতরণ

গোবিন্দ জেগে উঠে দেখলে, ট্রেন একটা নতুন স্টেশন ছেড়ে আবার চলতে শুরু করলে। সে বেঞ্চির উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়েছে। আর তার বুকটা করছে ভয়ে ধুকপুক! তার এতটা ভয় হবার কারণ সে আন্দাজ করতে পারলে না। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল?

তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল। সে যাচ্ছে কলকাতায়। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। আর তার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই গান্ধি-টুপি-পরা ঘোড়ামুখ।

মনে পড়তেই টপ করে সে উঠে বসল। কামরায় কেউ নেই। ঘোড়ামুখ অদৃশ্য। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, তার পা-কাঁপছে। আগে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে ফেললে। তারপর মনে মনে প্রশ্ন করলে, নোটগুলো যথাস্থানে আছে তো?

আবার শুনতে পেলে নিজের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যেন থ! জটাধর ছিল তো ওই কোণে— চকোলেট খাচ্ছিল, ঘুমোচ্ছিল, নাক ডাকাচ্ছিল! কখন জাগল? কখন গেল?...তা সকলেই তো তার মতো কলকাতার যাত্রী নয়! জটাধর নিজের স্টেশনে নেমে গেছে।

নোট তার পকেটেই আছে নিশ্চয়— ভালো করে আলপিনে গাঁথা। তবু একবার হাত দিয়ে দেখা যাক!

ওরে বাপ রে, এ কী! পকেট যে একেবারে খালি! নোট নেই, খাম নেই, কিছুই নেই! গোবিন্দ পাগলের মতো সব পকেট হাতড়ে দেখলে। নোট নেই.এটা কী? ও, সেই বড়ো আলপিনটা ওমাঃ! আলপিনটা যে আঙুলে ফুটে গেল! রক্ত পড়ে যে!

আঙুলে রুমাল জড়িয়ে গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। আলপিন ফুটেছে বলে সে কাঁদছে না, তার কান্না এসেছে টাকার শোকে। তার কান্না এসেছে মায়ের মুখ

মনে করে। কত খেটে, কত কষ্টে, মা এই টাকাগুলি জমিয়েছেন। আর সে কিনা রেলগাড়িতে চড়েই মজা করে একটা লম্বা ঘুম দিলে, একটা পাগলা স্বপ্ন দেখলে, আর একটা বিচ্ছিরি ঘোড়ামুখে চোরের হাতে তুলে দিলে অতগুলো টাকা!

এখন কী করবে সে? কোন মুখে হাওড়ায় নেমে মাসির বাড়ি গিয়ে দিদিমাকে বলবে, আমি এসেছি বটে, কিন্তু তোমার টাকা আনিনি। হ্যাঁ, আরও শুনে রাখো দিদিমা, বাড়ি ফেরবার সময়ে আমার রেলভাড়া দিতে হবে তোমাকেই!

অসম্ভব, অসম্ভব! মার টাকা জমানোই মিছে হল। দিদিমা কণাকড়ি পাবেন না! তার কলকাতা দেখাও হবে না, সে বাড়িতে ফিরে যেতেও পারবে না। ওরে ঘোড়ামুখ, সর্বনাশ করবি বলেই তুই কি আমাকে চকোলেট খেতে দিয়েছিলি, আর মিথ্যে নাম ডাকিয়ে পড়েছিলি মটকা মেরে? হায় রে হয়, পৃথিবীটা কী খারাপ জায়গা! গোবিন্দের চোখ ছাপিয়ে ঝরতে লাগল ঝর ঝর করে জল।

খানিকটা লোনা চোখের জল তার মুখের ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সে ভাবলে, কামরার কমিউনিকেশন কর্ড ধরে টান মেরে গাড়িখানা থামিয়ে ফেলি।

তারপর? গার্ডসায়েব আসবে। জিজ্ঞাসা করবে, কী হয়েছে? গাড়ি থামালে কেন?

সে বলবে, আমার টাকা চুরি গিয়েছে।

গার্ড হয়তো বলবে, হুঁশিয়ার না হলে তো টাকা চুরি যাবেই! তোমার নাম কী ছোকরা? তোমার ঠিকানা কী? মিছামিছি গাড়ি থামিয়েছ, তোমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে।

এখন কটা বেজেছে? কলকাতা আর কত দূরে? ঘোড়ামুখো জটাধর এখন কোথায়? সে অন্য কোনও কামরায় ঘুপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো? আশ্চর্য নয়। হয়তো পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই সে গাড়ি থেকে নেমে লম্বা দেবে!

গোবিন্দ কামরার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পিছিয়ে যাচ্ছে সবুজ গাছের ছায়া-মাখা গ্রাম, বড়ো বড়ো জমকালো

অট্টালিকা, লাল-সাদা-হলদে রঙের বাগানবাড়ি! কালীপুরে তো এমনধারা একখানা বাড়িও নেই! বোধহয় গাড়ি কলকাতা শহরের কাছেই এসে পড়েছে!

পরের স্টেশনেই গার্ডসায়েবকে ডেকে সব কথা খুলে বলতে হবে। গার্ড নিশ্চয়ই তখনই পুলিশে খবর দেবে।

কিন্তু তাহলে হবে আবার বিপদের উপর বিপদ! আবার আসবে নটবর চৌকিদার। এবারে সে আর চুপ করে থাকবে না। পুলিশের বড়োসায়েবকে ডেকে হয়তো বলবে, হুজুর,কেন জানি না, ও ছোকরাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। মুখুয্যেদের গাছ থেকে গোবিন্দ পেয়ারা চুরি করে খায়। ও বলছে, ওর একশো পাঁচশ টাকা চুরি গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওর টাকা চুরি যায়নি টাকাগুলো ও নিজেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। যে পেয়ারা চুরি করে,সে কি না করতে পারে? মিথ্যা চোরের খোজ করে লাভ নেই। চোর হচ্ছে গোবিন্দ নিজেই। টাকাগুলো নিয়ে ও বাড়ি থেকে পালাবার মতলব করেছে। হুজুর, গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিন?

কী ভয়ানক, পুলিশে খবর দেওয়াও তো চলবে না দেখছি। গাড়ি গতি কমে আসছে ধীরে ধীরে। বোধহয় পরের স্টেশন এল। গোবিন্দ নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল। পরে যা হবার তা হবে, কিন্তু এ গাড়িতে সে আর একদণ্ড থাকতে পারবে না। এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই তো স্টেশন। লোকজন গম গম করছে। গোবিন্দ স্টেশনের নামটা পড়ে দেখল— লিলুয়া। এটাও তাহলে কলকাতা নয়?

গাড়ির নানা কামরা থেকে যাত্রীরা নামছে। অনেকে আবার উঠছেও। চারিদিকে তাড়াহুড়ো আর চ্যাঁচামেচি।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোবিন্দ গার্ডকে খুঁজছে, হঠাৎ ভিড়ের ভিতরে দেখা গেল এক গান্ধি-টুপি! কে ও! সেই ঘোড়ামুখো জটাধর নয় তো? গাড়ি থেকে নেমে সরে পড়বার চেষ্টা করছে?

একটি লম্বা লম্ফ, পরমুহূর্তে গোবিন্দ একেবারে প্লাটফর্মের উপরে। তার ডান হাতে ব্যাগ, বাঁ হাতে কাগজে মোড়া ফুল। তারপর দৌড়।

কোথায় লুকাল সেই গান্ধি-টুপি? গোবিন্দ কখনও হোচট খায়, কখনও অন্য লোকের পায়ের উপরে গিয়ে পড়ে। ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে—প্রতি পদেই বাধা।

ওই যে সেই গান্ধি-টুপি আরে, ওখানে যে আরও একটা গান্ধি-টুপি রয়েছে। ওর মধ্যে কে চোর আর কে সাধু?

তিন চারজন লোককে ধাক্কা মেরে গোবিন্দ এগিয়ে গেল।

প্রথম গন্ধি টুপিটার তলায় সে দৃষ্টিপাত করলে। ওখানে ঘোড়ামুখ নেই।

দ্বিতীয় টুপিটা কার? উঁহু, ও-লোকটা বেজায় বেঁটে।

তবে সে কোথায়? সে কোথায়? ব্যূহের মধ্যে বন্দী অভিমনুর মতো গোবিন্দ জনতার ভিতর থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগল।

ওই যে— ওই যে! ওরে জটাধর, এইবার পেয়েছি তোকে। আর তোর নিস্তার নেই।

জটাধর গেটের কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। গোবিন্দও তাই করলে।

হ্যারিসন রোডের ট্রামগাড়ি

গোবিন্দ প্রথমে ভাবলে, একদৌড়ে চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলি, কী হে জটাধর, আমাকে চিনতে পারছ? টাকাগুলো কোথায় রেখেছ, বার করো দেখি?

কিন্তু লোকটার ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় না যে বলবে, তোমাকে চিনেছি বইকী! এই নাও ভাই তোমার টাকা। আর কখনও আমি চুরি করব না।

উঁহু, ব্যাপারটা এত সোজা নয়। পরের কথা পরে ভাবা যাবে, আপাতত ওকে চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া হবে না।

জটাধর চারিধারে তাকাতে তাকাতে চলেছে। একটা খুব মোটাসোটা মেমের দেহের আড়ালে আড়ালে থেকে গোবিন্দও অগ্রসর হচ্ছে।

আচ্ছা, মেমটাকে সব কথা খুলে বলব নাকি? বলব জটাধরকে ধরিয়ে দিতে?

কিন্তু জটাধর যদি বলে—সে কী মেমসাহেব, আমি কি এতই পাষণ্ড যে, অতটুকু ছেলের টাকা চুরি করব?

আর মেম যদি তার কথায় বিশ্বাস করে বলে— হাঁ, তোমাকে পাষণ্ড বলে মনে হচ্ছে না তো! কালে কালে হল কী? একরত্তি ছেলেরাও মিছে কথা বলতে শিখেছে!

হঠাৎ মেমসাহেব পাশের একটা গলির ভিতরে ঢুকল। পাছে ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে গোবিন্দ আরও পিছিয়ে পড়ল।

জটাধর চলেছে তো চলেছেই। সে কোথায় যাচ্ছে! গোবিন্দের হাতের ব্যাগটা যে দু-মন ভারী হয়ে উঠেছে! তার পা দুটোও আর চলতে চাইছে না। প্রতি পদেই তার মন বলছে, ওহে গোবিন্দ, ব্যাগটা মাটিতে রেখে বসে বসে একটু জিরিয়ে নাও। কিন্তু হায় রে, জিরিয়ে নেবার কি সময় আছে? জটাধর

যতক্ষণ হাঁটবে, ততক্ষণ তাকেও হাঁটতে হবে। হাটতে হাঁটতে গোবিদের গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে গেলেও উপায় নেই!

রাস্তা ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে! ভিড় বাড়ছে, গাড়ি-ঘোড়া বাড়ছে, বড়ো বড়ো বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে! তবে কি তারা কলকাতার কাছে এসে পড়েছে?

বাবা, পৃথিবীতে বড়ো বড়ো শহরের এক-একটা পথে এত রকম গাড়ি একসঙ্গে চলে নাকি?

না, আর যে পোষায় না! হেঁটে হেঁটে আমার পা বোধহয় ক্ষয়ে ছোটো হয়ে গেছে।

কী আশ্চর্য, ওটা আবার কীরকম বাড়ি? এত মস্ত! ওর ভিতরে কত লোক ব্যস্ত হয়ে ঢুকছে— কত লোক আবার ওখানে থেকে বেরিয়েও আসছে। হ্যাঁ মশাই, ওটা কার বাড়ি বলতে পারেন? কী বললেন? হাওড়া স্টেশন?

হুঁ, তাহলে হাওড়ায় এসেছি তার মানেই কলকাতায়! ওই হচ্ছে গঙ্গা, আর ওই হচ্ছে হাওড়ার পোল? জটাধর যে পোলের উপর দিয়েই চলল। বোধহয় ও কিছু সন্দেহ করেছে। খালি খালি চারিদিকে তাকাচ্ছে। আমাকে একবার দেখতে পেলেই ভোঁ-দৌড় মারবে!

এই তো পোল শেষ হয়ে গেল। এইবার বোধহয় কলকাতায় পা দিলুম? আর কত চলব, ব্যাগের ভারে হাত যে ছিড়ে যাচ্ছে!

কী ভিড় বাবা, কী ভিড়! কত গাড়ি! মনে হচ্ছে সব গাড়ি যেন আমাকে চাপা দিয়ে মারবার জন্যে রেগে-মেগে তেড়ে আসছে!

ওগুলো আবার কী গাড়ি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি লোকের মুখে ওর কথা শুনেছি, ওর ছবিও দেখেছি। ওর নাম ট্রামগাড়ি।

আরে, জটাধর যে ট্রামগাড়িতেই উঠে পড়ল! তাহলে—

গোবিন্দ প্রাণপণে দৌড়ে ট্রামগাড়ির উপর আগে নিজের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর নিজেও উঠে পড়ল।

জটাধর সামনের দিকের একটা সিটে গিয়ে বসল। গোবিন্দ রইল পিছন দিকে। গাড়ির দরজার কাছে এবং ভিতরেও জায়গার অভাবে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভিতর তার ছোটো দেহ একরকম অদৃশ্য হয়েই গেল।

এর পর কী হবে? জটাধর একবার যদি তাকে দেখতে পায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। সে একলাফ মেরে নীচে নেমে কোথায় পালিয়ে যাবে, এই ভারী ব্যাগটা নিয়ে গোবিন্দ তার পিছনে পিছনে ছুটতে পারবে না কিছুতেই!

ওঃ, রাস্তায় মোটরগাড়ি যে আরও বেড়ে উঠল। দুধারের ঢাঙা বাড়িগুলো যে শূন্যে উঠে আকাশকে ঢেকে ফেলবার জোগাড় করেছে। রাস্তার দুদিকেই সারি সারি কত সাজানোগুছানো দোকান! খাবারের দোকান, ফলের দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, মণিহারী দোকান! আর লোকের ভিড়ের তো কথাই নেই! এত লোকও শহরে ধরে? এই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে জটাধর একবার যদি ভিড়তে পারে, তাহলে আর কে পাবে তার পাত্তা?

গাড়িতে আরও লোক উঠছে। আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই, নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়। ভিড়ের মধ্যে জটাধর পাছে আবার ফাকি দেয়, সেই ভয়ে গোবিন্দ বারবার এর হাতের তলা, ওর পায়ের পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

একজন লোক বিরক্ত হয়ে বললে, ছোকরা তো ভারী ছটফটে দেখছি। ঢুঁ মেরে মেরে জ্বালাতন করে তুললে যে!

গোবিন্দ দেখল, ট্রামের কণ্ডাক্টর সকলের কাছে পয়সা নিয়ে একখানা করে টিকিট দিচ্ছে।

তার মাথায় যেন বাজ পড়ল। কি সর্বনাশ। আমার কাছে যে একটি আধলাও নেই। এবার সে নিশ্চয় আমার কাছে পয়সা চাইবে! পয়সা না পেলেই আমাকে ট্রাম থেকে নামিয়ে দেবে। তাহলেই তো জটাধরের পোয়া বারো।

আচ্ছা, কোন ভদ্রলোককে কি ডেকে চুপি চুপি বলব, মশাই আমাকে ট্রাম-ভাড়ার পয়সা কটা ভার দেবেন?

উঁহু, ওরা ধার-টার দেবে বলে মনে হচ্ছে না। ওদের মুখগুলো যা গোমড়া! যেন সারা দুনিয়ার ওপরেই ওরা বিরক্ত।

একজন আরোহী আর একজনকে ডেকে বললে, ওহে, পকেট সামলাও! আজকাল ট্রামে ভারি পকেট-কাটার অত্যাচার হয়েছে।

গোবিন্দ মনে-মনে বললে, খালি ট্রামে নয়, ট্রেনেও।

আর একজন আরোহী বললে, শুনেছি, জনকয় ভদ্রলোকের ছেলে দল বেঁধে এই কাজ করছে। তারা ট্রামে উঠে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পকেট সাফ করে। তাদের চেহারা আর পোশাক দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারে না।

গোবিন্দের রকম-সকম দেখে কেউ কেউ তার দিকেও সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকাতে লাগল। কেউ কেউ পাঞ্জাবী বা সার্টের পকেট টেনে কোলের উপর তুলে রাখলে।

কণ্ডাক্টর এসে গোবিন্দকে ডেকে বললে, টিকিট।

গোবিন্দ জানে, চুরির কথা বললে কেউ এখানে বিশ্বাস করবে না।

মাঝে মাঝে সত্য কথাও যে সাংঘাতিক হতে পারে সে এই প্রথম সেটা অনুভব করলে। বললে, আমার পয়সা হারিয়ে গেছে।

কণ্ডাক্টর বললে, পয়সা হারিয়ে গেছে? টিকিট কিনতে পারবে: না? এ গল্প আগেও আমি অনেকবার শুনেছি। কোথায় যাবে শুনি?

—আমি-আমি জানি না মশাই'-গোবিন্দ বললে বাধো বাধো গলায়।

—ও, তাই নাকি? কোথায় যাবে তাও জানা নেই? বেশ, এইবার ট্রাম থামলেই তুমি সুড় সুড় ক'রে নেমে যেও।

—তা তো আমি পারব না। আমাকে এই গাড়িতেই যেতে হবে।

—আমি যখন বলছি তখন তোমাকে নামতে হবেই, বুঝলে?

গোবিন্দের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। একটি ভদ্রলোক একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি মুখ তুলে বললেন, কণ্ডাক্টর, এই পয়সা নাও। ছেলেটিকে টিকিট দাও।

কণ্ডাক্টর গোবিন্দের হাতে টিকিট দিয়ে ভদ্রলোকটিকে বললে, আপনি জানেন না বাবু, প্রতিদিনই কত ছেলে ট্রামে উঠে এমনি বলে যে, তাদের পয়সা হারিয়ে গেছে। কেউ দয়া ক'রে পয়সা দিলে তারা আবার মনে মনে হাসে।

ভদ্রলোক বললেন, হ'তে পারে। কিন্তু এই ছেলেটি হাসবেনা!

কণ্ডাক্টর আর কিছু না ব'লে অন্য দিকে চ'লে গেল।

গোবিন্দ বললে, মশাই, আপনি আমার কী উপকার যে করলেন।

—কিছুনা খোকাবাবু, কিছু না। বলেই তিনি আবার খবরের কাগজের দিকে মুখ ফেরালেন।

গোবিন্দ বললে, আপনার নাম আর বাড়ির ঠিকানাটা কি, বলবেন?

—কেন?

—তাহলে পয়সাগুলো আবার ফিরিয়ে দিতে আসতে পারি। আমি কলকাতায় এখনো কিছুদিন থাকব। আমার নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়, বাড়ি কালিপুরে।

—গোবিন্দবাবু ভাড়ার পয়সা তোমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না। ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলুম। তুমি আরো কিছু পয়সা নেবে?

গোবিন্দ জোরে মাথা নেড়ে বললে,"না, না, আর আমার পয়সা 'চাই না।

ভদ্রলোক হেসে আবার কাগজ পড়তে লাগলেন। ট্রাম চলছে আর থামছে। এতক্ষণ গোবিন্দের যা ভয় হচ্ছিল। তাদের এই গোলমাল শুনে যদি জটাধর একবার মুখ ফেরাতো, তাহ'লে কী যে হ'ত! ভাগ্যে রাস্তার আর ট্রামের নানান শব্দে তাদের কথাবার্তা অতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছয়নি।

এটা কি রাস্ত? গোবিন্দ একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, হ্যারিসন রোড।

রাস্তাটা চমৎকার বটে, আরো ভালো ক'রে দেখতে পারলে বেশ হ'ত, কিন্তু খুটিয়ে অন্য কিছু দেখবার মত মনের অবস্থা তার নয়।

কোথায় যে যাচ্ছে, তাও সে জানে না! এত বড় শহর, আর সে কত ছোট! কেতাবে পড়েছে, কলকাতায় লোক আছে কম করেও একুশ লক্ষ। ওরে বাব্বাঃ! এর মধ্যে হারিয়ে গেলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

চাের জটাধর এখনাে ট্রামেই ব'সে আছে। হয়তো এর মধ্যে; জটাধারের মত আরো অনেক চোরের অভাব নেই। কিন্তু তাকে নিয়ে তারা কেউ বোধহয় আর কোন মাথা ঘামাচ্ছে না। ট্রামের আর কোন আরহীও কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে না যে, কেন তার কাছে পয়সা নেই, কেন সে জানে কলকাতা শহরটাই বোধ হয় বেয়াড়া, এখানে কারুর কথা জানবার জন্যে কারুর আগ্রহ নেই।

ভবিষ্যতে তার কপালে কি আছে কে জানে! গোবিন্দের মনেহলো এমন জনতার মধ্যেই সে যেন অত্যন্ত একাকী।

নমিতা সেন ও তার সাইকেল

নমিতা নিশ্চয়ই স্টেশনে আসত, কিন্তু দিদিমার আসবার কথা নয়।

কিন্তু গোবিন্দের মেসো চন্দ্রবাবুর হঠাৎ কাল রাত থেকে পেটের অসুখ হয়েছে, কাজেই তার পক্ষে আজ স্টেশনে আসা অসম্ভব! অন্য কোনও লোক পাঠালেও চলবে না। কারণ, গোবিন্দকে কেউ চেনে না।

অতএব দিদিমা বললেন, 'আমার নাতি এই প্রথম কলকাতায় আসছে, সে এখানকার কিছুই জানে না। যদি সে বিপদে পড়ে?... উঁহু, আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না। চাকরকে নিয়ে আমিই ইস্টিশানে যাব। রামফল, শিগগির একখানা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আন।

চাকর রামফল গাড়ি ডাকতে ছুটল।

নমিতা বললে, দিদিমা, মিছে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কী হবে? আমার সাইকেল আছে, আমি চালাব আর তুমি দিব্যি আরামে আমার সামনে উঠে বসে থাকবে?

দিদিমা শিউরে উঠে বললেন, বাপ রে, বলিস কী রে সর্বনাশী!

—কেন দিদমা, পাড়ার বন্ধু তো আমার সঙ্গে এক সাইকেলে চড়ে। তুমি কি বন্ধুর চেয়েও ভারী?

—ও কথা শুনলে তোমার বাবা এখুনি সাইকেল কেড়ে নেবেন।

নমিতা চোখ মুখ ঘুরিয়ে বললে, মা গো মা! দিদমার কাছে কোনও মনের কথাই বলবার জো নেই। এর মধ্যে আবার বাবার নাম ওঠে কেন?

হাওড়ায় স্টেশনে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে! কত গাড়ি এল, বাক্সপ্যাটরা নিয়ে কত লোকই নামল! নাকে চশমা লাগিয়ে দিদিমা ভালো করে দেখলেন, কিন্তু গোবিন্দের দেখা পান না।

নমিতা বললে,'গোবিন্দদা বোধহয় দেখতে খুব বড়ো হয়ে উঠেছে, আমরা কেউ আর তাকে চিনতে পারছি না।

দিদিমার বিশ্বাস হয় না! নমিতা হতাশভাবে টুং-টাং করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়। দিদিমার ইচ্ছা ছিল না যে, তার নাতনি সাইকেল ঘাড়ে করে স্টেশনে আসে। কিন্তু শেষটা সে এমন আবদার ধরে বসল যে, তিনি বলতে বাধ্য হলেন, নাতনি না পেতনি! বেশ, তাই নিয়ে চলো! কিন্তু রাস্তায় চড়তে পাবে না, গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে হবে!

নমিতা খুশি হয়ে বললে, তুমি কিছু বোঝে না দিদমা! আমার সাইকেল দেখে গোবিন্দদা যে কী অবাকটাই হবে! মানসচক্ষে ব্যাপারটা আর একবার দেখে নিয়ে সে বলে উঠল, ও হো, বড়ো মজা।...

...দিদিমার দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে। বললেন, নমু, কটা বাজল দেখ তো

নমিতা হাত তুলে নিজের হাতঘড়িটা দেখে বললে, বেলা একটা বাজতে বিশ মিনিট।

দিদিমা বললেন, এতক্ষণে তো গাড়ি এসে পড়বার কথা!

নমিতা বললে, আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আমি খবর নিয়ে আসছি।

একটু তফাতে একজন রেল-কর্মচারী ছিল, নমিতা সেখানে গিয়ে বললে, কালীপুরের গাড়ির খবর কি বলতে পারেন?

—কালীপুর, কালীপুর? ওঃ, হ্যাঁ, সে গাড়ি তো বারোটার আগে এসে গিয়েছে?

—এসে গিয়েছে? কাণ্ডটা দাখো একবার! বুঝছেন মশাই, সেগাড়িতে আমার গোবিন্দদার আসবার কথা।

—তাই নাকি ঠাকরুন! শুনে খুশি হলুম—শুনে খুশি হলুম, হা হা হা হা!

—অত হাসির ঘটা কেন শুনি? যেন একটি আস্ত জন্তু! বলেই নমিতা সাইকেল টানতে টানতে দিদিমার দিকে ছুটল।

নমিতা গিয়ে বললে, গাড়ি অনেকক্ষণ এসে গিয়েছে দিদমা!

দিদিমা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে বললেন, তাহলে কী হল বল দেখি? আজ না এলে তার মা নিশ্চয় টেলিগ্রাম করত। তবে কি গোবিন্দ কোনও ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছে?

খুব ভারিক্কের মতো মুখের ভাব করে নমিতা বললে, ঠিক বুঝতে পারছি না। গোবিন্দদা ভুল স্টেশনে নামতে পারে। ব্যাটাছেলেরা যা বোকা হয়! কোথায় যেতে কোথায় যায়! কিছু জানে না

আরও খানিকক্ষণ কাটল। নমিতা বললে, আর তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। আমার টিফিন খাবার সময় হল।

দিদিমা বললেন, কালীপুর থেকে পরের গাড়ি কখন আসবে?

—রোসো, খবর আনছি। বলেই নমিতা আবার সেই রেলকর্মচারীর কাছে গিয়ে হাজির। কর্মচারী তাকে দেখেই তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। নমিতা সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বললে, ও মশাই, শুনছেন? আপনি কি আমার ওপরে ভারী রেগে গিয়েছেন?

কর্মচারী না ফিরেই বললে, আবার তোমার কী দরকার?

—আপনার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। এর পরে কালীপুরের গাড়ি আবার কখন আসবে, দয়া করে বলবেন কি?

কর্মচারী এবার হেসে ফেলে ফিরে বললে, রাত সাড়ে আটটায়।

দিদিমার কাছে গিয়ে সেই খবর নিয়ে নমিতা বললে, গোবিন্দদা বোধহয় সেই গাড়িতেই আসবে। এখন বাড়ি চলো।

দিদিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না।

খবর শুনে বাড়ির সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। গোবিন্দ নিরুদ্দেশ! নমিতার বাবা চন্দ্রবাবু বললেন, কালীপুরে আমি একখানা টেলিগ্রাম করে দি।

নমিতার মা বিমলা বললেন, সর্বনাশ! আমন কথা মুখেও এনে না গো! দিদি তাহলে ভয়েই মারা পড়বেন। তার চেয়ে রাতের ট্রেনটা পর্যন্ত সবুর করো।

নমিতা বললে, গোবিন্দদার বুদ্ধি-সুদ্ধি বড়ো কম। সাড়ে আটটার সময়ে আমার ঘুম পাবে। সাইকেল নিয়ে ইস্টিশানে যেতে পারব না। আমার রাগ হচ্ছে। আমার খিদে পেয়েছে। মা, খাবার দাও।

চন্দ্রবাবু বললেন, আমার অসুখ কমে এসেছে। রাতে আমি স্টেশনে যেতে পারব। গোবিন্দ হয়তো সকালে ট্রেন ফেল করেছে।

দিদিমা বললেন, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না।

দুখানা শিঙাড়া আর দুটো সন্দেশ খেয়ে নমিতা তার ছোট্ট মাথাটি দিদিমার অনুকরণে নাড়তে নাড়তে বললে, আমিও এসব পছন্দ করি না।

ঘন্টু ও তার মোটর-হর্ন

ট্রাম যখন হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে এসে থামল, তখন গান্ধি-টুপি-পরা জটাধর হঠাৎ উঠে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এবারে গোবিন্দ ছিল অত্যন্ত সজাগ। সে-ও নেমে পড়ল যথাসময়ে। জটাধর আমহার্স্ট স্ট্রিটের ভিতরে ঢুকল। খানিক পরেই দেখা গেল, একখানা ছোট্ট ঘর এবং তার বাইরে একখানা মস্ত সাইন-বোর্ডে লেখা—'দি গ্রেট নর্দান রেস্তোরাঁ।'

জটাধর মুখ তুলে নামটা পড়লে। তারপর রেস্তোরাঁর বাইরে পাতা একখানা বেঞ্চির উপরে বসে বললে, চারখানা টোস্ট, দুখানা মামলেট, এক কাপ চা।

এদিকের ফুটপাথে একটু এগিয়েই গোবিন্দ পেলে একটা ছোট্ট গলি। সে সাঁত করে তার ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সেইখান থেকে জটাধরকে নজরে নজরে রাখলে।

জটাধর বসে বসে টানতে লাগল সিগারেট। তার মুখখানা খুশিখুশি! আজকের রোজগারটা ভালোই হয়েছে—খুশি হবে না কেন?

গোবিন্দ এখন ভবিষ্যতের কর্তব্য কিছুই জানে না। আপাতত খালি এইটুকুই জানে যে, জটাধরকে সে কিছুতেই আর অদৃশ্য হতে দেবে না!

জটাধরের হাসিমুখ দেখে তার গা জ্বালা করতে লাগল। হতভাগা চোর পরের টাকা চুরি করে কেমন নিশ্চিন্ত প্রাণে সকলের সুমুখে বসে আরাম করছে, আর চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হয়েছে তাকেই—চুরি গিয়েছে যার অতগুলো টাকা! ভগবান কি এসব দেখেও দেখছেন না? এর পর ও মজা করে খাবার খেয়ে ভরা পেটে কোথায় চলে যাবে, আর ক্ষিধেয় ধুঁকতে ধুঁকতে আবার তাকে কুকুরের মতো যেতে হবে তার পিছনে পিছনে! কী অবিচার!

এখন যদি কোনও পাহারাওয়ালা তাকে দেখতে পায়, তাহলেই হয় চূড়ান্ত। পাহারাওয়ালা নিশ্চয় তার কাছে এসে বলবে, ওহে, তোমাকে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তোমার ভাবভঙ্গি চোরের মতন! ভালোমানুষটির মতো আমার সঙ্গে থানায় চলো, নইলে বের করে হাত— পরো হাতকড়ি!

হঠাৎ একেবারে গোবিন্দের পিছনেই ভোপ ভোপ ভোপ করে মোটর-হর্নের বেজায় আওয়াজ হল। সে আঁতকে উঠে মস্ত এক লাফ মেরে পিছন ফিরেই দেখে, সার্ট ও প্যান্ট পরা একটা তারই সমবয়সী ছেলে হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়ছে!

সে বললে, সেলাম বাবু-সায়েব, অত বেশি ভয় পাবার দরকার নেই।

গোবিন্দ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য স্বরে বললে, মোটরের হর্ন বাজল, মোটরগাড়ি নেই তো!

ছোকরা বললে, ধ্যাত, তুমি ভারী বোকা! মোটর আবার কোতায়? হর্ন তো আমি বাজিয়েছি!.ও, বুঝেছি! তুমি এই অঞ্চলে থাকো না! এখানকার সবাই জানে, আমার কাছে সর্বদাই হর্ন থাকে!

—না, আমি তোমাকে চিনি না। আমার দেশ কালীপুরে, আমি সবে কলকাতায় এসেছি।

—ও পাড়াগেঁয়ে ছেলে, বটে। তাই তুমি অমন বেয়াড়া খালাসিরঙের পোশাক পরেছ? এই পোশাকটার সম্বন্ধে গোবিন্দেরও দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু পরের মুখ থেকে সে মায়ের দেওয়া পোশাকের নিন্দা শুনতে রাজি নয়। খাপ্পা হয়ে বললে, ফের ও-কথা বললে আমি তোমাকে ঘুষি মারব!

বালক খুশি-মুখেই বললে, আরে আরে—চটলে নাকি ভায়া? প্রথম আলাপেই কি এতটা রাগারাগি করতে আছে? তবে নিতান্তই যদি চাও, আমি তাহলে ঘুষি লড়তে রাজি আছি।

গোবিন্দ বললে, বেশ, আজ ওসব থাক। আমার এখন সময় নেই। — বলেই উঁকি মেরে একবার দেখে নিলে, জটাধরের গন্ধি টুপি রাস্তার ওধার থেকে অদৃশ্য হয়েছে কি না!

বালক বললে, আমি তো দেখছি তোমার হাতে এখন অনেক সময় আছে! তুমি তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ! তুমি যখন খেলতে পারো, তখন লড়তেই বা পারবে না কেন?

—আমি লুকোচুরি খেলছি না, একটা ধাড়ি চোরের ওপরে নজর রাখছি।

বালক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, কী বললে? চোর? কোথায়? কী চুরি করেছে?

গোবিন্দ গর্বিত স্বরে বললে, সে আমার টাকা চুরি করেছে। রেলগাড়িতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দিদিমাকে দেবার জন্য আমার পকেটে অনেক টাকা ছিল। ওই লোকটা সেই টাকা চুরি করে অন্য কামরায় লুকিয়ে ছিল। তারপর ট্রেন থেকে নেমে ট্রামে চড়ে এইখানে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি তার সঙ্গ ছাড়িনি। দ্যাখো না, এখন ও কেমন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে টোস্ট আর মামলেট খাচ্ছে?

বালক উচ্ছসিত স্বরে বললে, অ্যাঃ! বলো কী হে! এ যেন বায়োস্কোপের গল্প! .তারপর? এইবার তুমি কী করবে?

—কিছুই জানি না ভাই! তবে ওর পিছু আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

ওই তো একটা পাহারাওয়ালা আসছে। ওকে ধরিয়ে দাও না।

—না ভাই, না! কালীপুরে আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, হয়তো সেখানকার পুলিশ আমাকেও খুঁজছে। পুলিশ ডেকে শেষটা কি নিজেই বিপদে পড়ব?

—ও, বুঝেছি।

—হাওড়া স্টেশনে মেসোর বাড়ির সবাই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা কী ভাবছেন, জানি না।'

বালক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবলে। তারপর বললে, ব্যাপারটা খুব জব্বর বটে। আচ্ছা ভাই, তুমি যদি নারাজ না হও, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

—'তা যদি পারো, তাহলে তো আমি বর্তে যাই!

—বহুৎ আচ্ছা! আমার নাম কি জানো? ঘণ্টু।

—আমার নাম গোবিন্দ।

তারা পরস্পরের সঙ্গে শেক হ্যান্ড করলে। এতক্ষণ পরে তাদের দুজনেরই দুজনকে খুব ভালো লাগল!

ঘন্টু বললে, তাহলে কাজ শুরু করা যাক। এখানে আর বেশিক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চোর বেটা আবার ফাঁকি দেবে। ...হ্যাঁ, এখন প্রথম কথা হচ্ছে, তোমার কাছে টাকাপয়সা কিছু আছে?

—রামচন্দ্র। আমার হাত একেবারে ফোক্কা!

ঘন্টু হতাশভাবে তার মোটর-হর্নে বার-তিনেক খুব আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে। কিন্তু তবু তার বুদ্ধি খুলল না।

গোবিন্দ বললে, আচ্ছা ভাই ঘন্টু, কিছু ধার-টার দিতে পারে তোমার কি এমন বন্ধুবান্ধব নেই?

ঘন্টু উৎসাহিত স্বরে বললে, খাসা বুদ্ধি দিয়েছ। হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই আমি করব। এর জন্যে আমাকে বেশি বেগ পেতে হবে না! আমি যদি আমার হর্ন বাজাতে বাজাতে এ-পাড়ার অলিগলিতে এক-চক্কর ঘুরে আসি, তাহলেই আমার বন্ধুবান্ধবরা ছুটে আসবে চারিদিক থেকে!

—তাহলে চটপট সেই চেষ্টাই করো গে যাও। কিন্তু মনে রেখো, তোমার দেরি হলে জটাধর সরে পড়বে। তখন আমাকেও যেতে হবে তার পিছনে পিছনে। তুমি ফিরে এসে আমাদের কারুকেই আর দেখতে পাবে না।

ঘন্টু বললে, হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার কোনও ভয় নেই। দেখছ না জটাবেটা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, এখনও তার চা খাওয়া হয়নি, তার ডিশেও রয়েছে পুরো একখানা মামলেট! আমি যাব আর আসব। এটা হবে জব্বর ব্যাপার গোবিন্দ, জব্বর ব্যাপার, অবাক কাণ্ড বলেই সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন চালিয়ে দিলে পা!

এতক্ষণ পরে গোবিন্দের মনটা হল খানিকটা ঠান্ডা। দুর্ভাগ্যকে আর কিছু বলা যায় না, দুর্ভাগ্য ছাড়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সময় কাছে বন্ধু থাকলে সেটাও একটা সান্তনা বইকী!

জটাধর মামলেটে আবার এক কামড় বসিয়ে আক্রমণ করলে চায়ের পেয়ালাকে। গোবিন্দ মনে মনে বললে, হতভাগা হয়তো আমার মায়ের টাকা ভাঙিয়েই খাবারের দাম দেবে। তারপর ও যদি একখানা রিকশা ভাড়া করে চম্পট দেয়, তাহলে ঘণ্টু তার হর্ন বাজিয়েও আমার আর কোনও উপকারই করতে পারবে না?

কিন্তু জটাধর তখনও ওঠবার নাম পর্যন্ত করলে না। মামলেট আর টোস্ট খেতে তার ভারী ভালো লাগছে বোধহয়! সে একটুও সন্দেহ করতে পারেনি যে, ট্রেনের সেই পাড়াগেঁয়ে ছোকরা তার পিছনে পিছনে এতদূর এসে হাজির হয়েছে এবং তার চারিধারে এমন এক ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, যার ভিতরে পড়লে চুনো পুঁটি নয়, বড়ো বড়ো রুই-কাতলারও ছাড়ান পাবার কোনও উপায়ই থাকবে না!

মিনিট-কয় পরেই শোনা গেল ঘন্টুর মোটর হর্ন বাজছে—ভোঁপ ভোঁপ ভোঁপ!

তাড়াতাড়ি ফিরে দেখে, গলি দিয়ে আসছে প্রায় দুই ডজন ছোকরার পলটন! দলের সব আগে রয়েছে ঘণ্টু—মুখে মোটর-হন গর্বিত তার ভঙ্গি!

ঘণ্টু হঠাৎ হর্ন নামিয়ে একখানা হাত মাথার উপরে তুলে বললে, সৈন্যগণ, দাঁড়িয়ে পড়ো!

সৈন্যদের মার্চ, বন্ধ হল তৎক্ষণাৎ। গোবিন্দ দুই হাতে ঘণ্টুকে জড়িয়ে ধরে বললে, ভাই, আমার যে কী আহ্লাদ হচ্ছে?

ঘণ্টু বললে, বন্ধুগণ, কালীপুরের গোবিন্দবাবুকে দ্যাখো! এর বিপদের কথা তোমাদের কাছে এর আগেই খুলে বলেছি। যে দুরাত্মা এর সর্বনাশ করেছে, ওই দাখো সে আরামে বসে চায়ে চুমুক মারছে। ওকে যদি আমরা পালাতে দি, তাহলে আমাদের অপমানের আর সীমা থাকবে না!

চশমাপরা একটি ছেলে বললে, ইনি নাকি, ওকে আর আমরা পালাতে দিলে তো?

ঘণ্টু বললে, গোবিন্দ, একে আমরা প্রফেসর বলে ডাকি। প্রফেসরের সঙ্গে গোবিন্দ শেক হ্যান্ড করলে। তারপর ঘণ্টু একে একে আর-সব ছেলের সঙ্গে গোবিন্দকে পরিচিত করে দিলে।

++++++++++++++++++

প্রফেসর গম্ভীর মুখে বললে, এইবার কাজের কথা হোক.বন্ধুগণ, তোমাদের কাছে যা আছে, আমাকে দাও।

গোবিন্দ তার রুমাল বিছিয়ে ধরলে! প্রত্যেক বালক কিছু না-কিছু চাঁদা দিলে। কেউ এক আনা, কেউ দু আনা, কেউ দশ পয়সা, কেউ পাঁচ আনা, কেউ আট আনা, একজন একটা টাকাও দিলে।

ঘন্টু বললে, মঙ্গলবার, আমাদের মূলধন কত হল দ্যাখো তো।

যার নাম মঙ্গল, বয়স তার সাত-আট বছরের ভিতরেই। দলের সবাই তাকে মঙ্গলবার বলে ডাকে। টাকা-পয়সা গোনবার ভার পেয়ে আনন্দে সে নাচতে

লাগল চড়াইপাখির মতো! গণনা শেষ করে মঙ্গল বললে, পাঁচ টাকা দশ আনা দু পয়সা। আমার মত হচ্ছে, আমাদের মূলধন তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। কারণ যদি আমাদের আলাদা আলাদা কাজ করতে হয়, তাহলে একজনের কাছে টাকা থাকলে চলবে না।

প্রফেসর বললে, সাধু প্রস্তাব! মঙ্গলবারের পুঁচকে মাথাতে একটুও বাজে মাল নেই, সবটাই বুদ্ধিতে ভরা।

গোবিন্দের হাতে দেওয়া হল দুই টাকা, প্রফেসর ও ঘণ্টু পেল যথাক্রমে দুই টাকা ও এক টাকা সাড়ে দশ আনা।

গোবিন্দ বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ! চোর ধরা পড়লেই তোমাদের টাকা ফিরিয়ে দেব। এখন আমরা কি করব? হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। আমার এই ব্যাগটা আর ফুলগুলো কোথায় রাখি বলো তো? যদি আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়—

ঘণ্টু বললে, ব্যাগ আর ফুল আমাকে দাও দি গ্রেট নর্দান রেস্তোরার মালিকের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে, ও-দুটো ওইখনেই জিম্মা রেখে দেব আর সেই সঙ্গে জটাবেটাকে আরও ভালো করে দেখে আসব।

প্রফেসর বললে, কিন্তু খুব সাবধান জটাবেটা একবার যদি সন্দেহ করে তার পিছনে লেগেছে ডিটেকটিভরা, তাহলে যথেষ্ট বেগ দিতে পারে।

ঘণ্টু যেতে যেতে বিরক্ত স্বরে বললে, তুমি কি আমাকে এতটা হাঁদা-গঙ্গারাম ভেবেছ হে?

খানিক পরেই সে ফিরে এসে বললে, জটাবেটার মুখ ফোটোয় তুলে রাখবার মতো। গোবিন্দ, তোমার মালের জন্যে কিছু ভেবো না।

গোবিন্দ বললে, এইবারে আমাদের পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু এ-জায়গায় দাঁড়িয়ে গোপন কথা কওয়া তো চলবে না।

প্রফেসর বললে, বেশ তো, চলো না আমার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাই। আমাদের দু জন এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিক। পাঁচ-ছ জন থাক পথের মাঝে মাঝে কিছু ঘটলেই তারা একদৌড়ে আমাদের খবর দিয়ে আসবে।

ঘণ্টু বললে, তোমরা যাও, বাকি সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তোমার কোনও ভাবনা নেই গোবিন্দ, আমি নিজে এখানে হাজির থাকব।

ডিটেকটিভদের পরামর্শ-সভা

পার্কের এক কোণে ডিটেকটিভদের সভার অধিবেশন। সকলে গোল হয়ে ঘাস-জমির উপরে গিয়ে বসে পড়ল—কেউ উবু হয়ে, কেউ হাঁটু গেড়ে, কেউ দু পা ছড়িয়ে।

প্রফেসর দাঁড়িয়ে মাঝখানে। তার বাবা হচ্ছেন আদালতের জজ। গভীর কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার বাবা যেমন চোখ থেকে চশমাখানা খুলে নাড়াচাড়া করতে থাকেন, ঠিক সেই ভাবেই চশমাখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে প্রফেসর বললে, খুব সম্ভব, আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাব না। কাজেই খবর লেনদেনের জন্যে আমাদের একটা টেলিফোন দরকার। কার কার বাড়িতে টেলিফোন আছে?

সাত-আটজন বালক হাত তুললে।

—উত্তম। এখন দেখতে হবে তোমাদের মধ্যে কার মা-বাপের মেজাজ সবচেয়ে ঠান্ডা।

মঙ্গল বললে, আমার মা-বাবা ভারী ঠান্ডা। কখনও আমি বকুনি খাইনি।

—উত্তম, মঙ্গলবার! তোমাদের টেলিফোনের নম্বর কী?

মঙ্গল নম্বর বললে।

—বুদ্ধ, কাগজ-পেনসিল বার করো। এক এক টুকরো কাগজে মঙ্গলবারের টেলিফোন নম্বর লিখে সকলের হাতে বিলি করে দাও। যার কোনও খবর দেবার বা জানবার দরকার হবে, মঙ্গলবারের কাছে গেলেই চলবে।

মঙ্গল বললে, কিন্তু আমি তো থাকব বাইরে।

প্রফেসর দৃঢ়স্বরে বললে, না। সভাভঙ্গ হলেই তোমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

মঙ্গল প্রতিবাদ করে বললে, বা রে! তোমরা চোর ধরবে আর আমি দেখতে পাব না, তাও কি হয় দাদা? বয়সে ছোটো হলেও আমি তোমাদের অনেক কাজেই তো লাগতে পারি?

—তুমি বাড়িতে টেলিফোনের কাছে থাকবে। এটা হচ্ছে মস্ত-বড়ো কাজ!

একটু নিরাশ স্বরে মঙ্গল বললে, বেশ।

বুদ্ধ নম্বরের কাগজ বিলি করে দিলে। অনেকে যত্ন করে পকেটে রাখলে, অনেকে আবার তখনই তখনই নম্বরটা মুখস্থ করে ফেললে।

গোবিন্দ বললে, জনকয় বাড়তি লোক আমাদের হাতের কাছে রাখা উচিত।

প্রফেসর বললে, নিশ্চয়। আপাতত যাদের দরকার হবে না তারা এই পার্কেই অপেক্ষা করুক। আগে সকলকেই বাড়িতে খবর দিতে হবে যে, আমরা আজ একটু বেশি-রাতেই বাড়ি ফিরব। যাদের মা-বাবা অবুঝ, তারা যেন বলে যে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ডিটেকটিভ বিভাগ, বাড়তি বিভাগ টেলিফোন আপিস—এ-সবের ব্যবস্থা একরকম হল।

গোবিন্দ বললে, আমাদের কাজ কখন শেষ হবে, বলা যায় না! এর মধ্যে কিছু খাবারের দরকার হবে না কি?

—হবে বইকী! খাদু, গাবু, নন্দ, মধু, কালু! তোমাদের বাড়ি খুব কাছেই! চট করে কিছু খাবার জোগাড় করতে পারো কি না দাখো না।

পাঁচটা ছেলে উঠে দৌড় মারলে।

মানকে বললে প্রফেসর, তোমার বুদ্ধি বড়ো কম! টেলিফোন, খাবার আর যত বাজে ব্যাপার নিয়ে তো এতটা সময় কাটালে; কিন্তু আমরা চোর ধরব কেমন করে, তা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামালে না দেখছি! যত-সব ইশকুল-মাস্টার, খালি বক-বক করে বকতেই জানে?

ঝন্টু সিনেমায় অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনীর ছবি দেখে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। সে বললে, আমাদের কাছে চোরের আঙুলের ছাপ নেবার কোনও মেশিন নেই, আমরা কি করে প্রমাণ করব যে, সেই-ই হচ্ছে চোর?

মানকে বললে, আঙুলের ছাপের নিকুচি করেছে! আমরা সুবিধা পেলেই জটাবেটাকে ধরে টাকাগুলো কেড়ে নেব!

প্রফেসর বললে, গাঁজাখুরি কথা শোনো একবার! কেউ যদি আমার টাকা চুরি করে, আর তার কাছ থেকে সেই টাকাই আমি আবার চুরি করি, তাহলে আমিই হব চোরা!

—হ্যাঁ!

—বাজে বোকো না।

গোবিন্দ মধ্যস্থ হয়ে বললে, প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। টাকা আমার হোক আর না হোক, কারুর কাছ থেকে লুকিয়ে নিলেই চুরি করা হয়।

প্রফেসর বললে, এখন বুঝলে তো? সুতরাং মুরুব্বির মতন লেকচার দিয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না। জানি না চোরকে ধরবার জন্যে আমরা কোন উপায় অবলম্বন করব, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। চোরকে আমরা বাধ্য করব চুরির টাকা ফিরিয়ে দিতে। আমরা চুরিটুরি করতে পারব না।

খুদে মঙ্গলবার বললে, এসব কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। যে টাকা আমার, চোরের পকেটে গেলেও সে টাকা আমারই থাকবে। তবে আমার টাকা লুকিয়ে ফিরিয়ে নিলে চুরি করা হবে কেন?

প্রফেসর বললে, এসব ব্যাপার সহজে বোঝানো যায় না। হয়তো আসলে তুমি অন্যায় করছ না, কিন্তু আইনে তুমি হবে অপরাধী।

মানকে বললে, হেঁয়ালি-টেয়ালি নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না।

ঝন্টু বললে, ডিটেকটিভ হতে গেলে রিভলভার চাই।

মঙ্গল বললে, খেলা করবার জন্যে বাবা আমাকে একটা রিভলভার কিনে দিয়েছেন। সেটা আনব নাকি?

আর একজন বললে, ধ্যাত, সে রিভলভারে একটা মশা পর্যন্ত মারা যায় না। আমাদের চাই সত্যিকার রিভলভার!

প্রফেসর বললে, না!

গোবিন্দ বললে, চোর ধরতে গেলে বিপদ তো হতেই পারে। যার ভয় হচ্ছে, সে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকুক।

মানকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে বললে, তুমি কি আমাকে কাপুরুষ বলতে চাও?

প্রফেসর দুই হাত তুলে বললে, শান্ত হও–শান্ত হও! আজ নয়, কাল লড়াই কোরো! এসব কী ব্যাপার! ছি, ছি, আমরা কি শিশু?

খুদে মঙ্গল বললে, নিশ্চয়! আমরা শিশু নই তো বুড়ো-মানুষ নাকি? সবাই হেসে উঠল।

গোবিন্দ বললে, দাখো, আমার মাসির বাড়িতেও একটা খবর দেওয়া দরকার, সেখানে আমার জন্যে সবাই বড়ো ভাবছে। আমার মাসির বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে দশ নম্বর হরেন ঘোষ লেন। কেউ কি সেখানে আমার একখানা চিঠি দিয়ে আসতে পারবে?

ছটু বলে একটি ছেলে বললে, হাঁ, আমি দিয়ে আসব।

কাগজ পেনসিল চেয়ে নিয়ে গোবিন্দ লিখলে,

শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তোমরা সবাইবোধহয় ভাবছ, আমি এখন কোথায়? আমি কলকাতায়। তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে যেতে পারছি না, কারণ আগে আমাকে একটা ভারী-দরকারি কাজ সারতে হবে। কাজ ফুরুলে আমি আর একটুও দেরি

করব না—এক দৌড়ে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব। আমার কাজটা কী জানতে চেয়ো না। যে ছেলেটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, আমি কোথায় আছি সে তা জানে। কিন্তু সে-ও আমার সন্ধান হয়তো দেবে না, কারণ এটা হচ্ছে ভয়ানক গুপ্তকথা। মেসোমশাইকে, মাসিমাকে আমার প্রণাম আর নমিতাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো।

সেবক—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়

পুঃ—মা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে! মাসিমাকে বোলো, মা তার জন্যে ফুল পাঠিয়েছেন, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

গোবিন্দ চিঠিখানা ছটুর হাতে দিয়ে বললে, কিন্তু সাবধান, টাকাচুরির কথা আর আমার ঠিকানা কারুকে জানিয়ো না। তাহলে আমি ভারী বিপদে পড়ব।

ছটু চলে গেল। তারপরই পাঁচটি ছেলে ফিরে এল খাবারের পাঁচটা কৌটাে হাতে করে। কেউ এনেছে লুচি, কেউ আলুর দম, কেউ সিদ্ধ ডিম, কেউ কচুরি-ডালপুরি।

নন্দ বললে, আমার মা এই বিস্কুটের টিনটা দিলেন। কতক খাবার তারা তখনই খেয়ে ফেললে, কতক তুলে রাখলে রাত্রের জন্য। খেয়ে-দেয়ে সবচেয়ে খুশি হল গোবিন্দই, কারণ দলের মধ্যে তার চেয়ে ক্ষুধার্ত ছিল না আর কেউ।

পাঁচটি ছেলে বাড়িতে ফিরে গেল—ছুটি চাইবার জন্যে। তাদের মধ্যে দুজন আর এল না—তাদের মা-বাবা ছুটি দেননি। মঙ্গলও বাড়িতে ফিরে গেল।

প্রফেসর বললে, মানকে, আমার বাড়িতে একটা ফোন করে দিস যে, আমার ফিরতে রাত হবে। বাবা তাহলে আমি বাইরে আছি বলে আর কিছু বলবেন না।

গোবিন্দ বললে, কলকাতার বাপ-মায়েরা তো খুব ভালো দেখছি!

আজ সকালেই বাপের হাতের কান-মলা খেয়ে মানকের কান তখনও টাটিয়ে ছিল। সে গজগজ করে বললে, সব বাপ মাই যদি এত সহজে বুঝতেন, তাহলে আর ভাবনা ছিল কী!

প্রফেসর বললে, মানকে, বাপ-মাকে ভুল বুঝিসনে। বাবার কাছে আমি অঙ্গীকার করেছি, তার চোখের সামনে যে-কাজ করতে পারব না, তা আমি কখনও করবও না! বাবা জানেন, আমি মিথ্যা বলি না, তাই আমাকে বিশ্বাস করেন। যাক এসব কথা। এখন যাবার আগে শুনে রাখে প্রত্যেকে নিজের কর্তব্য পালন করবে, নইলে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে না। আজ রাতের মতো খাবার আমাদের সঙ্গেই আছে। পাঁচজন ডিটেকটিভ সর্বদাই এখানে হাজির থাকবে। কারুর কিছু জানবার দরকার হলেই টেলিফোন আপিসে গিয়ে খবর নেবে হ্যাঁ, আর একটা কথা। আজ আমাদের দলের সঙ্কেত-বাক্য হবে—'গোবিন্দ'। যে এই সঙ্কেত-বাক্য বলতে পারবে না, নিশ্চয় জেনো, সে আমাদের দলের লোক নয়! মনে থাকবে তো? আমাদের সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'!

—"আমাদের সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'!

—প্রত্যেক ছেলে একস্বরে এই কথা বলে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, সারা পাড়ায় ছুটে গেল তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি!

গোবিন্দ ভাবলে, টাকা চুরি না গেলে তো আমি আজ এমন সব বন্ধুর দেখা পেতুম না! কী মিষ্টি এই ছেলেগুলি!

কুমারী নমিতা সেনের সাইকেল

আচম্বিতে দেখা গেল, গুপ্তচর তিনজন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে এবং তাদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে মাথার উপরে হাতগুলো নাড়ছে ঠিক পাগলের মতই।

প্রফেসর বললে, এই রে, জটাবেটা বোধহয় ঘণ্টার চোখে ধুলো দিয়েছে? প্রফেসর, গোবিন্দ ও মানকে এমন বেগে দৌড় মারলে, যে, তাদের দেখলে মনে হয়, দেড়-প্রতিযোগিতায় তারা পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু খানিক দূর এগিয়েই তারা দেখলে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘণ্টু তাদের আস্তে আসবার জন্যে ইশারা করছে। তখন তারা গতি কমিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রফেসর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ব্যাপার কী? জটাবেটা সরে পড়েছে নাকি?

ঘণ্টু বললে, তাহলে আমি কি এখানে বসে ঘাস কাটছি? ওই দাখো?

রেস্তোরার সুমুখে দাঁড়িয়ে জটাধর তখন এমন পরিতৃপ্তভাবে প্রশান্ত মুখে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছে, যেন তার চোকের সামনে রয়েছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্যাবলী! সেখানে দিয়ে একটা বাংলা খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছিল, সে একখানা কাগজ কিনলে।

মানকে বললে, 'নচ্ছারের আবার কাগজ পড়ার শখ আছে!

বুদ্ধ বললে, ও যদি এ ফুটপাতে এসে আমাদের আক্রমণ করে তাহলেই মুশকিল। সকলে মুখ লুকোবার জন্যে চোরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল এবং চিপ-চিপ করতে লাগল তাদের বুকগুলো।

কিন্তু চোর তাদের দিকে ফিরেও তাকালে না, একমনে নিযুক্ত হয়ে রইল খবরের কাগজ নিয়ে।

মানকে বললে, আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজের আশপাশ দিয়ে ও উকি মেরে দেখছে, আমরা ওকে লক্ষ করছি কি না!

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলে, ঘণ্টু, তোমরা যে এখানে পাহারা দিচ্ছ এটা ও ধরে ফেলেনি তো?

—উঁহু। ও আমাদের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। এমন গোগ্রাসে কেবল খাবার গিলেছে, যেন ও বহুকালের উপবাসী!

গোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠল, দ্যাখো, দ্যাখো!

একখানা খালি ট্যাক্সিগাড়ি যাচ্ছিল, চোর হঠাৎ তাকে ডাকলে। ট্যাক্সি থামল। চোর এক লাফে উপরে উঠল। গাড়ি বোঁ করে চলে গেল।

কিন্তু সে গাড়ির ভিতরে চোর ওঠবার আগেই সদা-সতর্ক ঘণ্টু রাস্তার মোড়ের দিকে দৌড় দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও। মোড়ের মাথায় তিনখান ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঘণ্টু লাফ মেরে তার উপরে উঠে ড্রাইভারকে ডেকে বললে, ওই যে সামনের ট্যাক্সি দেখছ, ওর পেছনে পেছনে চলো। কিন্তু সাবধান, ওরা যেন জানতে না পারে, আমরা ওদের পেছনে যাচ্ছি।

খানিক এগিয়েই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারখানা কী?

ঘণ্টু বললে, ব্যাপার গুরুতর। ও যদি নরকেও যায়, আমরা ওর সঙ্গ ছাড়ব না।

ড্রাইভার বললে, ভাড়া পেলে আমি নরকেও যেতে রাজি আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমাদের কাছে ভাড়া আছে কি?

প্রফেসর রাগ করে বললে,'তুমি আমাদের কী মনে করো?

ড্রাইভার বললে, বললুম একটা কথার কথা।

গোবিন্দ বললে, আগের ট্যাক্সিখানার নম্বর হচ্ছে ৪৪৪।

প্রফেসর নম্বরটা টুকে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, এটা খুব দরকারি।

মানকে বললে, ড্রাইভার, তুমি ওদের অত কাছে যেয়ো না।

পরে পরে গাড়ি দুখানা ছুটছে। রাস্তার লোকেরা দ্বিতয়ি গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়— গাড়ি ভরতি রকম-বেরকম খোকা, সকলের মুখ উত্তেজিত!

হঠাৎ ঘণ্ট বললে, নীচে শুয়ে পড়ো—নীচে শুয়ে পড়ো!

সকলেই গাড়ির নীচের দিকে বাপ খেলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলে, হল কী?

ঘণ্টু বললে, এটা রাস্তার চৌমাথা ট্রাপিক-পুলিশ হাত তুলেছে, সামনের গাড়ির সঙ্গে আমাদেরও এখানে থামতে হবে। চোর একবার ফিরে তাকালেই সর্বনাশ।

দুখানা গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়ল মোড়ের মাথায়। এবং চোর সত্য সত্যই ফিরে তাকালে। কিন্তু তার পিছনের গাড়িতে কারুকেই দেখতে পেলে না। সেখানা ঠিক যেন খালি গাড়ি! দেখলে কে বলবে যে, তার মধ্যে একগাড়ি ছেলে আছে!

দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভারও পিছন ফিরে দেখে বুঝলে, ব্যাপারখানা কী! সে হো-হা করে। হেসে উঠল!

পথ খোলা পেয়ে আবার সব গাড়ি ছুটতে শুরু করলে। ছেলেরা আবার যথাস্থানে। প্রফেসর মিটারের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, ভাড়া উঠল আট আনা। ও বাবা, আরও কত দূরে যেতে হবে?

কিন্তু আর বেশিদূর যেতে হল না। চোরের ট্যাক্সিখানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আপার সার্কুলার রোডের আদর্শ ভোজনালয়ের সামনে।

জটাধর গাড়ি থেকে নামল। তারপর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভোজনালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

প্রফেসর বললে, ঘণ্টু, তুমিও হোটেলের ভেতরে যাও। ও বাড়িখানার খিড়কির দরজা থাকে তো নজর রেখো। সামনের দিকে আমরা আছি।'

তাদের ভাড়া উঠল বারো আনা। ওদিকে ফুটপাতের পরেই রয়েছে একটা ছোটো বাজার। প্রফেসর বললে, আমাদের বরাত ভালো। এই বাজারের ভেতর আশ্রয় নিলে কেউ আমাদের বাধা দেবে না। এখানে লুকিয়ে আমরা অনায়াসেই হোটেলের ওপরে পাহারা দিতে পারব। বুদ্ধু, তুমি ঘণ্টুর খোঁজে যাও। সকলে বাজারের দিকে গেল। মানকে বললে, বাঃ, এখানে একটা 'পাবলিক টেলিফোনও আছে যে!

গোবিন্দ বললে, ঘণ্টুর মাথা বেশ সাফ হলেই মঙ্গল।

ঝন্টু বললে, ঘণ্টুকে তুমি চেনো না গোবিন্দ! দেখতে তাকে গাধার মতো বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে সে চতুর শৃগাল!

প্রফেসর বুকের উপরে দুই হাত রেখে বললে, এখন ঘণ্টু ফিরলে বাঁচি যে! তাকে তখন দেখাচ্ছিল পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে লর্ড ক্লাইভের মতো।

ঘণ্টু একমুখ হাসি নিয়ে ফিরে এল। বললে, মা ভৈঃ! জটাবেটাকে এইবারে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! সে হোটেলের একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ও-বাড়ির খিড়কি-দরজা নেই। আমি তন্ন তন্ন করে সব জায়গা খুঁজেছি। ফুড়ুক করে উড়ে পালাবার জন্যে জটার যদি ডানা না থাকে, তাহলে সে ফাঁদে পড়েছে!

ঘণ্টু বললে, তুমি আচ্ছা নিরেট তো! সে কথা আবার বলতে?

প্রফেসর বললে, মানকে, এইবার আমাদের টেরিফোন আপসি খবর দিতে হবে। পাবলিক ফোন থেকে কথা কইলেই চলবে। ফোনের দাম এই দু-আনা নিয়ে যা!

মানকে তখনই ফোনে নম্বর বলে ডাকলে, হ্যালো, মঙ্গলবার?

সাড়া এল—হাজির! —সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'! জটাবেটা আপার সার্কুলার রোডের 'আদর্শ ভোজনালয়ের' ঘর ভাড়া করেছে। আমাদের 'হেড-কোয়ার্টার' হয়েছে ভোজনালয়ের সামনের বাজারে।

খুদে মঙ্গলবার সমস্ত খবর একখানা কাগজে লিখে রাখলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের কি আরও লোকের দরকার?

—না।

—জটাবেটা হোটেলে কত নম্বরের ঘর ভাড়া নিয়েছে?

—সে খবর পরে দেব।

—তোমরা কি করে তার সঙ্গে সঙ্গে গেলে?

মানকে সংক্ষেপে বর্ণনা করলে।

—চোর এখন কী করছে?

—হয় খাটের তলায় উকি মেরে দেখছে সেখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না, নয় একলা বসে তাস খেলছে!

—আহা, আমি যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারতুম! এবারে ইশকুলের রচনা প্রতিযোগিতায় আমি এই ঘটনাটাই বর্ণনা করব।

—এর মধ্যে আর কেউ তোমাকে ডেকেছে?

—না, ভারী একঘেঁয়ে লাগছে। একলা বসে খালি কড়িকাঠ গুনছি। ও হো হো, আমি যে সঙ্কেত-বাক্যটা বলতে ভুলে গিয়েছি—'গোবিন্দ'!

—সঙ্কেত-বাক্য 'গোবিন্দ'! আচ্ছা, আসি!

প্রফেসর বললে, উত্তম!

ঘণ্টু বললে, সন্ধে হল। জটাবেটাকে আজ বোধহয় ধরা যাবে না।

গোবিন্দ বললে, সে এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লেই বাঁচি। নইলে সে যদি আমার মায়ের টাকায় আবার ট্যাক্সি নিয়ে নবাবি করতে বেরোয়, কি থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখতে যায়, তাহলে আমাদের মূলধনে আর কুলোবে না!

ইতিমধ্যে প্রফেসর একবার বাইরে টহল মেরে এসে বললে, কী উপায়ে আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা যায়, তোমরা একবার গভীর চিন্তা করে দাখো দেখি।

তারা একটা রোয়াকে বসে খানিকক্ষণ নীরবে গভীর চিন্তায় নিযুক্ত হয়ে রইল।

আচম্বিতে শোনা গেল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

প্রফেসর চমকে বললে, ও কি ও?

মানকে বললে, একখানা চকচকে নতুন সাইকেলে চড়ে একটি টুকটুকে মেয়ে বাজারের উঠোনে ঢুকছে!

ঝন্টু আশ্চর্য স্বরে বললে, আরে সাইকেলে আমাদের ছটুও বসে আছে যে!

ছটু মাথার উপরে হাত নাড়তে নাড়তে বললে, হিপ হিপ হুর রে!

গোবিন্দ আনন্দে নৃত্য করে বললে, সাইকেলে মেয়ে? নিশ্চয় নমিতা!

টুক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে নমিতা বললে, হ্যাঁ, আমি কুমারী নমিতা সেন। আর তুমি নিশ্চয় পলাতক গোবিন্দদা?

গোবিন্দ দৌড়ে গিয়ে নমিতার হাত ধরে ফিরে বললে, বন্ধুগণ, আমার মাসতুতো বোন কুমারী নমিতা সেন! নমস্কারের আদান প্রদান হল।

প্রফেসর নাক থেকে চশমা নামিয়ে নাড়তে নাড়তে গম্ভীর স্বরে বললে, কুমারী নমিতা সেনের পরিচয় পেয়ে আমরা ধন্য হলুম। কিন্তু ছটু, আমি বলতে বাধ্য যে, তুমি অতি অন্যায় করেছ?

—আমি আবার কী অন্যায় করলুম?

—মূর্খ! কী অন্যায় করেছ তাও বুঝতে পারছ না? তোমাকে কি আমাদের গুপ্তকথা প্রকাশ করতে মানা করা হয়নি?

—কে বলে আমি গুপ্তকথা প্রকাশ করেছি? আমি তো কেবল নমিতা সেনকে এখানে নিয়ে এসেছি।

নমিতা সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বললে, নিয়েও তুমি আসোনি বাপু, আমি জোর করে নিজের সাইকেলে তোমাকেই তুলে নিয়ে এখানে এসেছি।

খালি তাই নয়, আমি বাড়ির লোককে লুকিয়ে এখানে এসেছি। আবার এখুনি আমাকে পালাতে হবে।

প্রফেসর বললে, কুমারী নমিতা সেন, এ-ব্যাপারের মধ্যে নারীর থাকা উচিত নয়।

কিন্তু নমিতা তাকে আর আমলে না এনে গোবিন্দের দিকে ফিরে বললে, হাঁ গোবিন্দদা, আমরা মরছি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে, আর তুমি এখানে দিব্যি অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে মেতে আছ! ভাগ্যে ছটু গেল, নইলে আবার আমাদের হাওড়া স্টেশনে ছুটতে হত। কিন্তু ছটু ছেলেটি বেশ, তোমার বন্ধু-ভাগ্য ভালো গোবিন্দদা।

ছটু অতিশয় বিনয়ে মাথা নত করলে। নমিতা বললে, কিন্তু ব্যাপারটা কী বলো দেখি গোবিন্দদা? ভয় নেই, আমি কারুকে কিছু বলব না?

গোবিন্দ অল্প কথায় সব বললে।

নমিতা বললে, ওহো, এ যে সত্যিকার সিনেমা! বেটা-ছেলেদের যতটা বোকা ভাবি, তাহলে তারা ততটা বোকা নয়! হা গোবিন্দদা, তোমার বন্ধুগুলিও বেশ! আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে ওই প্রফেসরটিকে। চমৎকার চশমা খাসা গভীর মুখ! তুমিই বুঝি গোয়েন্দা-সর্দার?

এইবার প্রফেসরের গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে বেড়িয়ে পড়ল খিল খিল করে কৌতুকের হাসি! তারপর অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে প্রফেসর আবার গাম্ভীর্যের কেল্লার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বললে, কুমারী নমিতা সেন, আমি তোমার কাছে হার মানলুম। তুমি ধন্যি মেয়ে।

নমিতা বললে, গোবিন্দদা, আমার হাতে আর সময় নেই। দিদমা, বাবা, মা, নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাকে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেন। আমি ছটুকে সদর খুলে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেব বলে পালিয়ে এসেছি! আমাকে খুঁজে না পেলে এখনই পুলিশে খবর দেবে। একদিনে ছেলে আর মেয়ে দুইই হারানো তারা সইতে পারবে না।

গোবিন্দ বললে, বাড়ির সবাই আমার ওপরে খুব চটে গিয়েছেন তো?

—ধ্যাত, চটবে কেন? তোমার চিঠি পেয়েই দিদমা আহ্লাদে পাগলের মতো হয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন— আমরা নাতি কলকাতায় এসেই লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। বাবা আর মা অনেক কষ্টে দিদিমাকে ঠান্ডা করে বসালেন। আচ্ছা গোবিন্দদা, আমি পালাই। নমস্কার প্রফেসর! এতদিন পরে একজন জ্যান্ত ডিটেকটিভ দেখবার সৌভাগ্য হল, ধন্য আমি সে দু পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, গোবিন্দদা, এই একটা টাকা রেখে দাও, তোমাদের দরকার হতে পারে। একখানা অ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস কিনব বলে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে এই টাকাটা আমি জমিয়েছিলুম। কিন্তু আজ তুমি যে আসল অ্যাডভেঞ্চার দেখালে, তারপর আর কেতাবের বানানো গল্প না পড়লেও চলবে। আমি আবার কাল সকালে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করব। রাতে কোথায় শোবে গোবিন্দদা? আমি এখানে থাকলে তোমাদের জন্য চা তৈরি করে দিতে পারতুম, কিন্তু উপায় কি—লক্ষ্মীমেয়েদের বাড়িতেই থাকা উচিত, না প্রফেসর? আচ্ছা, সবাইকে নমস্কার!! দুচারবার আদর করে গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে নামিতা ছোট্ট একটি লাফ মেরে সাইকেলের উপরে উঠল এবং হাসিমুখে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানকে বললে, বাবা, মেয়ে যেন কথার ফুলঝুরি! আমাদের কারুকে আর মুখ খুলতে দিলে না।

ঘণ্টু বললে, এক্কেবারে পাকা গিন্নি!

প্রফেসর অভিভূতের মতো বললে, ধন্য, ধন্য, ধন্য!

কালীপুরের পাখির গান

মিনিটের পর মিনিট এগিয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দ একবার সন্তপর্ণে বাজারের ভিতর থেকে বেরুল। তারপর আদর্শ ভোজনালয়ের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলে, বুদ্‌ধ ও আরও দুটি ছেলে রীতিমতো পাহারায় মোতায়েন আছে।

তারপর ফিরে এসে বললে, দাখো, আমাদের আরও কিছু করা দরকার! হোটেলের ভেতরও একজন গুপ্তচর না রাখলে চলবে না। বুদ্ধু ঠিক হোটেলের সদর-দরজার সামনেই আছে বটে, কিন্তু সে একবার যদি অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ফেরায়, তাহলে জটাধরের টিকি কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!

ঘণ্টু বললে, তুমি তো ফস করে খুব সহজেই কথাটা বলে ফেললে, কিন্তু হোটেলের ভেতর আমাদের কারুকে থাকতে দেবে কেন? আর ভেতরে থাকলে বিপদেরও ভয় তো আছে! জটাবেটা যদি আমাদের কারুকে চিনে ফেলে?

—না, না, হোটেলের ভেতরে আমাদের কেউ থাকবে কেন?

প্রফেসর বললে, তবে তুমি কী বলতে চাও?

গোবিন্দ বললে, আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছি, হোটেলে একটা ছোকরা-চাকর আছে আর সে বার বার ওঠা-নমা করছে। সে-ও তো আমাদেরই বয়সী, তাকে কি আমাদের দলে টেনে নেওয়া যায় না?

—সৎ পরামর্শ। প্রফেসর বললে, হাঁ, গুড আইডিয়া! প্রফেসর ঠিক ইশকুলের শিক্ষকের মতোই মুরুব্বিয়ানা করে কথা কয়, সেই জন্যেই সবাই তার নাম রেখেছে প্রফেসর। সত্যি, গোবিন্দ ভারী বুদ্ধিমান। এ-রকম আর একটা ভালো পরামর্শ দিলেই গোবিন্দকে আমরা একটা উপাধি দিতে বাধ্য হব। কে বলে গোবিন্দ পাড়াগেঁয়ে ছেলে!

ঘণ্টু বললে, কলকাতায় থাকলে গোবিন্দের বুদ্ধি আরও খুলত!

পল্লিগ্রামের ছেলে গোবিন্দ আহত স্বরে বললে, পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা বুদ্ধির জন্ম কলকাতার বাইরেই। সাড়ে পনেরো আনা কেন, প্রায় ষোলো আনাই। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, তোমার সঙ্গে এখনও আমার ঘুষির লড়াই বাকি আছে।

প্রফেসর বললে, ঘুষির লড়াই!

—হ্যাঁ, বক্সিং। ঘন্টু আমার নীলরঙের পোশাককে অপমান করেছে।

প্রফেসর বললে, উত্তম। কালচোর ধরা পড়বার পর তোমাদের মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থা করব।

ঘণ্টু হাসতে হাসতে বললে, গোবিন্দ, এতক্ষণ ধরে দেখে দেখে আমার এখন মনে হচ্ছে যে, আসলে তোমার নীলরঙের পোশাকটি দেখতে বিশেষ মন্দ নয়। অবিশ্যি তোমার সঙ্গে ঘুষি লড়তে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। কেবল এইটুকু মনে রেখো ভায়া, কলকাতার এ-অঞ্চলে ঘুষির লড়াইয়ে কেউ আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না!

গোবিন্দ বললে, কালীপুরের ইশকুলেও আমার ঘুষি খেয়ে কোনও ছেলেই দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না!

প্রফেসর বললে, ঘন্টু গোবিন্দ! এখানে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বাক্য-নবাবি করে সময় কাটিয়ো না, প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান! আমি এখন হোটেলের দিকে যেতে চাই। কিন্তু তোমাদের দুজনকে এখানে রেখে যেতেও আমার ভয় হচ্ছে! কারণ আমি গেলেই তোমরা হয়তো মারামারি শুরু করে দেবে!

ঘন্টু বললে, বেশ, আমিই না হয় যাচ্ছি! প্রফেসর বললে, উত্তম! সেই ছোকরা-চাকরকে দলে টানবার চেষ্টা করো। কিন্তু খুব সাবধান! জটাবেটার ঘরের নম্বরটাও জেনে নিয়ো। একঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে রিপোর্ট দেবে!

ঘন্টু অদৃশ্য! বাজারের প্রবেশপথের রোয়াকের উপর বসে গোবিন্দ ও প্রফেসর নিজের নিজের ইশকুলের মাস্টারদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

গোবিন্দ বললে,"আমি আঁক শিখেছি বেতের ভয়ে। আমাদের আঁকের মাস্টার কোনও ভুল করলেই পিঠে তার বেতের ডোরা-দাগ কেটে দেন।

প্রফেসর বললে, আমিও বাধ্য হয়ে খুব ভালো আঁক কষতে শিখেছি। কারণ, আঁকে যে-ছেলের মাথা খোলে না তার মাথায় গাধার টুপির ঢাকনা বসিয়ে দেন আমাদের আঁকের মাস্টার।

গোবিন্দ বললে, বেতের চেয়ে গাধার টুপি ভালো।

প্রফেসর বললে, ভালো নয়, ভদ্র বলতে পারো। বেতে জখম হয় দেহের উপরটা। গাধার টুপি আহত করে দেহের ভিতরে মনকে। মফঃস্বলের মাস্টার বেশি-বর্বর, আর শহরের মাস্টার বেশি-নিষ্ঠুর। কারণ দেহের ঘা সারে দুদিনে, আর মনের ঘা সারতে লাগে অনেক দিন।

গোবিন্দ বললে, তুমি অমন জ্ঞানীর মতন কথা কইতে শিখলে কেমন করে?

—বাবার কাছ থেকে। বাবা যা বলেন, আমি মন দিয়ে শুনি!

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমার বাবা স্বর্গে। তিনি বেঁচে থাকলে আমিও তোমার মতো কথা কইতে পারতুম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, আমার খিদে পেয়েছে।

প্রফেসর বললে, আমারও।

তারা দুজনে কৌটোর ভিতর থেকে দুখানা করে লুচি ও একটা করে আলুর দম বার করে ক্ষুধার অত্যাচার দমন কররে।

তারা সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে রাস্তার আলোর থামগুলো জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের কোলাহল ও রেলগাড়ির

শব্দ শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু। তার সঙ্গে দিয়েছে রাজপথের ট্রাম, লরি, মোটর, সাইকেল ও রিকশা প্রভৃতির আওয়াজ এবং জনতার হট্টগোল। এ যেন একটা বন্য কনসার্ট।

গোবিন্দ বললে, দ্যাখো প্রফসর, শহরের এই বাড়ির, গাড়ির আর মানুষের ভিড়ে মাঝে মাঝে এক-একটা সবুজ গাছ দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? ওরা যেন ঠিক আমারই মতো। মফস্বল থেকে এখানে এসে পড়ে ওরা যেন ভুল করে পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে!

গোবিন্দ বললে, স্বীকার করি। কিন্তু ওসব গছে তো খালি পাখির ডাকই শুনলুম,— গান তো গাইলে না কোনও পাখি! পাখির গান বলতে আমি কাক-চিল-চড়াইয়ের চিৎকার বুঝি না, প্রফেসর।

প্রফেসর এত সহজে কলকাতার দীনতা মানতে রাজি নয়। বললে, গানের পাখিদের আমরা আদর করে ভালো খাঁচায় আশ্রয় দি, আর তাদের গান শুনি সারাদিন।

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বললে, না ভাই প্রফেসর! পাখির গান বলতে কী বোঝায় তা যদি শুনতে চাও, তাহলে আমাদের কালীপুরে যেয়ো। সেখানে সকলে তুমি প্রথমেই জেগে উঠবে যেন পাখির গানের স্বপনপুরে। সে তোমার দু-চারটে খাঁচার পাখির কান্না-গান নয়, হাজার হাজার পাখির আনন্দ-গান--যেন অন্ধকারকে হারিয়ে দিয়েছে বলে আলোর উদ্দেশে বিজয় গান! ঘর থেকে বেরিয়ে এলে দেখবে, রোদ-হাসি-মাখা সবুজে-ছাওয়া নাচঘরে কোকিল গাইছে, দোয়েল-শ্যামা শিস দিচ্ছে, খঞ্জন নাচছে, বউ-কথা-কও বউকে সাধাসাধি করছে আর তিতির ধরেছে যেন টিটকারির সুর! আরও কত-রকম পাখির কত গানের কথা। সেখানে দুপুরে ডাকে, গান গায় অন্য রকম নানা পাখি, আবার রাতে চাঁদের আলোর আসর রাখতে আসে নতুন নতুন দলের পাখিরা। পাখির গানের কথা

তুলো না প্রফেসর, তাহলে আমাদের কালীপুরের পাশে বসে তোমাদের কলকাতা কিছুতেই একজামিনে পাস করতে পারবে না।

প্রফেসর বললে, হার মানলুম গোবিন্দ! দেখছি তুমিও তো কম কথা জানো না! তুমি বুঝি কবিতা-টবিতা লিখতে পারে!

গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বললে, কবিতা পড়েছি বটে, কিন্তু লিখিনি তো কখনও!

—এইবার থেকে লিখো। তুমি কবি হতে পারবে। কিন্তু আঁক না কষে কবিতা লিখলে তোমার মা বোধহয় বকবেন?

—আমার মা? আমার মা কখনও আমাকে বকেন না। আমার যা-খুশি করতে পারি। কিন্তু আমি যা-খুশি করতে চাই না। বুঝলে?

—উহু, বুঝলুম না।

++++++++++++++++++++++++++++

—বুঝলে না? তবে শোনো। তোমরা কি খুব ধনী?

—জানি না গোবিন্দ! আমার বাড়িতে টাকার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

—টাকার কথা নিয়ে কেউ মাথা যখন ঘামায় না তখন নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক টাকা আছে।

প্রফেসর কিছুক্ষণ ভেবে বললে, হতে পারে।

—কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমাকে টাকাকড়ির অনেক কথাই কইতে হয়। কারণ আমাদের টাকাকড়ি বড়ো কম। এত কম যে, মাকে টাকা রোজগারের জন্যে দিন-রাত খাটতে হয়। তবু মা আমাকে রোজ এত পয়সা দেন যে, বড়োলোকের ছেলেরাও তার চেয়ে বেশি পায় না।

—কী করে তোমার মা দেন?

—তা জানি না। তবে দেন। কিন্তু তবু সব পয়সা খরচ না করে মায়ের কাছে কিছু কিছু আমি ফিরিয়ে আনি।

—তোমার মা কি তাই চান?

—তিনি চান না, কিন্তু আমি চাই।

—ও, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তেমনি, মা যদি আমাকে খেলবার জন্যে দুঘণ্টা ছুটি দেন, আমি এক ঘণ্টা খেলা করেই ফিরে আসি। মা ঘরকন্নার কাজ নিয়ে একলাই ব্যস্ত হয়ে থাকবেন আর আমি খেলে খেলে বেড়াব, তা কি হয় ভাই? মা আমাকে খেলতে ছুটি দেন বটে, কিন্তু আমি জানি ছেলে তাঁর কাছে কাছে থাকলে তিনি ভারী খুশি হন। তাই আমি যা-খুশি করতে চাই না। এইবারে বুঝলে?

রাত হয়েছে। তারা উঠেছে। শহরের গ্যাসের আলোর সঙ্গে মিলেছে অল্প-অল্প চাদের আলো। পথের গোলমাল, কমে আসছে ধীরে ধীরে।

এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির ভিতরে প্রফেসর একটি নতুন রূপ দেখতে পেলে। তার হাতখানি স্নেহভরে নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে মৃদুস্বরে বললে, মাকে বুঝি তুমি খুব ভালোবাসো?

গোবিন্দ বললে, হাঁ! খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।

ঘণ্টুর বকশিশ লাভ

রাত যখন দশটা বাজে বাজে, একদল ছোকরা বাজারের ভিতরে এসে হাজির সঙ্গে করে এনেছে তারা এত মাখন আর পাউরুটি যে, তার দ্বারা মস্ত এক সৈন্যদলের খোরাকের কাজ চলতে পারে।

প্রফেসর বিরক্ত হয়ে বললে, তোমাদের থাকবার কথা পার্কে। দরকার হলে আমি ফোনে তোমাদের ডাকতুম। তবু কেন তোমরা এখানে এসেছ—যখন কেউ তোমাদের ডার্কেনি?

ঝন্টু বললে, মুখ-নাড়া দিয়ো না প্রফেসর! এখানে কী কাণ্ড চলছে জানতে না পেরে আমরা সবাই পেট ফুলে মারা যাবার মতো হয়েছি।

নন্দ বললে, আমাদের দুর্ভাবনাও হয়েছিল! অনেকক্ষণ খবর না পেয়ে ভেবেছিলুম, হয়তো তোমরা কোনও বিপদে পড়েছ।

—পার্কে এখন কজন আছে?

খাদু বললে, তিন কী চারজন।

ঝন্টু খাপ্পা হয়ে চেঁচিয়ে বললে, প্রফেসর, তোমার মোড়লগিরি আর সহ্য হয় না! তোমার হুকুম কেন আমরা শুনব?

প্রফেসর মাটিতে লাথি মেরে বললে, আমাদের তালিকা থেকে এখনই ঝন্টুর নাম কেটে দেওয়া হোক!

গোবিন্দ বললে, আমার উপকার করতে এসে তোমরা কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধাতে চাও? ঝন্টুর নাম কেটে না দিয়ে এবারে তাকে খালি সাবধান করে দেওয়া হোক। সবাই যদি নিজের নিজের মতো চলে, তাহলে মিলে-মিশে কোনও কাজই করবার উপায় থাকে না যে?

ঝন্টু বললে, চুলোয় যাক তোমাদের কাজ! আমি আর তোমাদের মধ্যে নেই!'বলেই হন হন করে চলে গেল।

নন্দ বললে, আমরা প্রথমে আসতে চাইনি প্রফেসর! ঝন্টুই আমাদের নিয়ে এল।

প্রফেসর ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আর ঝন্টুর নাম কোরো না। তাকে ভুলে যাও।

খাদু বললে, আমরা এখন কী করব?

গোবিন্দ বললে, ঘন্টু ফিরে না আসা পর্যন্ত এইখানেই তোমরা থাকো।

প্রফেসর বললে, সেই কথাই ভালো। ...গোবিন্দ, হোটেলের সেই ছোকরা-চাকরটা এইদিকেই আসছে না?

—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

নন্দ তারিফ করে বললে, ওর পরনে কী চমৎকার উর্দি?

উর্দি-পরা বাচ্চা-চাকরটা ভিতরে এসে দাঁড়াল। আধা-অন্ধকারে তার মুখখানা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না।

প্রফেসর বললে, ঘণ্টু কি তোমাকে পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ?

—সঙ্কেত-বাক্য?

—গোবিন্দ বলো মন, গোবিন্দ!

গোবিন্দ হেসে ফেলে বললে, হুঁ, তুমি তো খুব রসিক দেখছি! এখন খবর কী বলো।

হঠাৎ বেজে উঠল এক মোটর-হন—ভোঁপ ভোঁপ ভোঁপ! সঙ্গে সঙ্গে সেই উর্দি পরা ছোকরা হো হো হাসি হাসতে হাসতে এমন এক তাণ্ডব-নাচ শুরু করে দিলে, যেন খেপে গিয়েছে একেবারে!

তারপর সে হাসি-নাচ থামিয়ে বললে, গোবিন্দভায়া, তুমি ডাহা অন্ধ!

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বললে, আরে, তুমি যে আমাদের ঘণ্টু।

আর সব ছেলেও হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী!

প্রফেসর বললে, অতুল! অপূর্ব সাধু! কিন্তু হাসির ঘটা থামাও। ঘণ্টুও এদিকে এই রোয়াকে এসে বসো। রিপোর্ট দাও।

ঘণ্টু বললে, "এ একেবারে রীতিমতো নাটক! শোনো: আমি হোটেলের ভেতরে গেলুম!

সিঁড়ির ওপরে হোটেলের সেই ছোকরা দাঁড়িয়েছিল। আমি চোখ মটকে ইসারা করলুম। সে কাছে এল। বললুম সব কথা—A থেকে Z পর্যন্ত। বললুম গোবিন্দের কথা, চোরের কথা, আমাদের কথা। এও জানালুম, কাল সকালেই আমরা তাকে জব্দ করব। আজ রাতটা আমি খালি হোটেলের ভেতরে থেকে চোরের ওপরে পাহারা দিতে চাই।

সব শুনে ছোকরার উৎসাহ, আগ্রহ আর আনন্দ দেখে কে? বললে, আমার আর একটা উর্দি আছে। সেইটে পরে তুমি পাহারা দাও।

আমি বললুম, হাোটেলের যদি কেউ আপত্তি করে?

সে বললে, কর্তারা রাতে এদিকে আসে না! চোর যে ঘরে আছে তার পাশেই আমার ঘর। আমি তোমাকে সেইখানেই লুকিয়ে রাখব।

বুঝেছ প্রফেসর, আজ থাকো তোমরা বাজারে পড়ে, কিন্তু আমর অদৃষ্টে আছে হোটেলের বাস।

প্রফেসর বললে, তুমি যদি হোটেলে থাকে, তাহলে আমাদের রাত কাটাতে হবে কেন? আমরাও বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে পারি। চোর যে ঘরে আছে তার নম্বর কত?

—পনেরো। শোনো, এখনও, আমার সব কথা বলা হয়নি। জটাবেটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।

গোবিন্দ উত্তেজিত স্বরে বললে, অ্যাঁ।

—হ্যাঁ। উর্দি পরে হোটেলের দোতলায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পনেরো নম্বর ঘরের দরজা খুলে গেল। তারপর বেরিয়ে এল জটাবেটা নিজে। দেখেই চিনলুম। গান্ধি-টুপি-পরা সেই ঘোড়ামুখ, একবার দেখলে কি এ-জীবনে ভোলা যায়?

আমি তাকে সেলাম ঠুকে বললুম, আপনার কি কিছু দরকার আছে বাবু?

সে বললে, না ...হ্যাঁ, একটা কথা শুনে রাখো। কাল ঠিক বেলা আটটার সময়ে আমাকে তুলে দিয়ো। এই নাও বকশিশ, বলেই সে আমাকে একটা দুয়ানি উপহার দিলে।

আমি আবার সেলাম করে বললুম, যে আজ্ঞে হুজুর! আমি ভুলব না।

তারপর সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল তুলে দিলে।

প্রফেসর বললে, উত্তম! মহারাজ কাল সকালে জেগে উঠে দেখবেন, আমার সৈন্যদল তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

নন্দ বললে, মাছ তাহলে জালে পড়েছে। এখন জাল তুলতেই যা দেরি।

ঘণ্টু বললে, আমি তাহলে এখন আসি। কাল সকালে চোরকে জাগিয়ে দিয়েই আমি আবার এইখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

গোবিন্দ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, ভাই ঘণ্টু, তুমি আজ আমার যে উপকারটা—

ঘন্টু বাঁধা দিয়ে বললে, ওসব কথা যেতে দাও ভাই গোবিন্দ? এরা তো শুনছি আজ। রাতের মতো বাড়ি যাচ্ছে, তুমি কোথায় যাবে? মাসির বাড়ি?

গোবিন্দ শিউরে উঠে বললে, বাপ রে, টাকার ব্যবস্থা না করেই? উঁহু!

ঘণ্টু বললে, তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে এসো। বলে-কয়ে তোমাকেও আজকের রাতটা হোটেলে রাখতে পারব।

গোবিন্দ বললে, রাজি!

প্রফেসর বললে, বন্ধুগণ, তাহলে আজ আর কারুর এখানে থাকার দরকার নেই। আমিও এখন মঙ্গলবারকে ফোন করে বাড়িতে যাব। কিন্তু সবাই

স্মরণ রেখো, কাল সকাল সাড়ে-সাতটার ভেতরে সকলকেই আবার এখানে আসতে হবে। ঠিক এখানে নয়, কারণ এটা হচ্ছে বাজার, সকালে ভিড়ে দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে না। বাজারের পাশেই যে মাঠটা রয়েছে, কাল ওইখানেই হবে আমাদের হেড-কোয়ার্টার। মনে থাকে যেন, কাল সকাল সাড়ে সাতটা, পাশের মাঠ।

ঘণ্টু হেসে বললে, হ্যাঁ সর্দার!

—পারো তো সঙ্গে করে কিছু কিছু পয়সা এনো। বিদায়!

একঘণ্টা পরেই ডিটেকটিভদের দল যে-যার বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারা ঘুমুল বিছানায়, কিন্তু খুদে মঙ্গলের অদৃষ্টে সে-রাতে তখনও বিছানা জোটেনি। মাঝ-রাতে তার বাবা আর মা থিয়েটার থেকে বাড়িতে ফিরে সবিস্ময়ে দেখলেন টেরিফোনের টেবিলের সামনে, চেয়ারের কুশনের উপর হেলে তাঁদের ছোট ছেলে মঙ্গল ঘুমিয়ে রয়েছে।

মা তাকে কোলে তুলে যখন বিছানায় শোয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, ঘুমের ঘোরে বিড়-বিড় করে সে.বললে, সঙ্কেত-বাক্য, গোবিন্দ..সঙ্কেত-বাক্য, গোবিন্দ!

জটাধরের রক্ষী সৈন্য

আদর্শ ভোজনালয়ে'র পনেরো নম্বর ঘরটি ছিল একেবারে বড়ো রাস্তার উপরে।

পরদিন সকালে জটাধর যখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আরশিচিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত, তার কানে ঢুকল অনেক ছোটো ছোটো ছেলের চিৎকার।

জটাধর জানলার কাছে এসে দেখলে, রাস্তার ওধারকার মাঠে অন্তত: দুই ডজন ছেলে খেলছে ফুটবল।

হোটেলের ঠিক তলা থেকে এল আর একদল ছেলের চিৎকার।
জটাধর মনে মনে ভাবলে, পুজোর ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ কিনা, ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নেই।

মাঠের এক প্রান্তে গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রফেসর চোখ থেকে চশমা খুলে নাড়াতে নাড়াতে বলছিল, না, এত অসম্ভব সব মুখ নিয়ে কাজ করা অসম্ভব! চোর ধরবার উপায় আবিষ্কার করবার জন্যে দিন-রাত আমি মাথা ঘামিয়ে মরছি, আর তোমরা কিনা সব পণ্ড করবার চেষ্টায় আছ! খবর দিয়ে সারা কলকাতাকে এখানে ডেকে এনেছ! আমরা যাত্রা করছি না থিয়েটার করছি যে, আমাদের দর্শক দরকার হবে? তোমাদের পেটে কি একটাও গুপ্তকথা থাকে না? এখন চোর যদি চম্পট দেয়, দায়ী হবে তোমরা, হে মূখের দল!

প্রফেসরের এই প্রাঞ্জল বক্তৃতার ফলে, কেউ কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয়েছে বলে বোধ হল না।

নন্দ বলল, ভয় নেই প্রফেসর, জটাবেটাকে আমরা কিছুতেই পালাতে দেব না?

প্রফেসর বললে, এখন শোনো গাধার দল। যা করেছ তা করেছ, কেবল এইটুকু দেখো, ছোকরারা যেন আর হোটেলের সামনে না যায়। বুঝেছ? অগ্রসর হও!

গুপ্তচরেরা প্রস্থান করল। রইল শুধু ডিটেকটিভরা।

মানকে বললে, বে-পাড়ার ছেলেগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব নাকি?

প্রফেসর বললে, তাড়ালে ওরা যদি যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল কী! পৃথিবী উলটে গেলেও ওরা আর এখান থেকে এক পা নড়বে না।

গোবিন্দ বললে, তাহলে আমাদের একটা নতুন ফন্দি আঁটতে হবে! লুকোচুরি যখন আর চলবে না, তখন এসো, চোরকে আমরা চারিদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলি! সে স্বচক্ষে দেখুক, আমরা কী করতে চাই!

প্রফেসর বললে, ও-কথা আমিও যে ভাবিনি তা নয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায়ও নেই।

গোবিন্দ বললে, চোরের পেছনে দেড়শো ছেলে যদি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে যেতে থাকে, তাহলে পুলিশের নজরে পড়বার ভয়ে টাকাগুলো সে আবার ফিরিয়ে না দিয়ে পারবে না!

আর সবাই মহা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং।

সাইকেলের ঘণ্টা কুমারী নমিতা সেন!

গুড মনিং! বলেই নমিতা মাঠের উপরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

সাইকেলের 'হ্যান্ডেল-বারে' ঝুলছিল একটি 'বাস্কেট'।

সেটি খুলে নিয়ে নমিতা বললে, আমি দুটো ফ্লাস্কে করে চা, মাখন-মাখানো টেস্ট আর একটা কাপ এনেছি। নাও, তোমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নাও!

ডিটেকটিভরা সানন্দে পান-ভোজনে নিযুক্ত হল। চায়ের পেয়ালার হাতল ছিল না বটে, কিন্তু তার জন্যে অসুবিধা হল না কিছুমাত্র।

মানকে বললে, চমৎকার লাগল!

নমিতা বললে, বাড়িতে মেয়ে না থাকলে কি লক্ষ্মীশ্রী আসে?

ছটু শুধরে দিয়ে বললে, বাড়িতে অর্থাৎ মাঠে?

গোবিন্দ বললে, 'বাড়ির খবর ভালো তো?

নমিতা বললে, হ্যাঁ গোবিন্দদা। কিন্তু দিদ্‌মা বলেছেন তুমি যদি শিগগির বাড়িতে না ফেরো, তাহলে রোজ তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে।

গোবিন্দ বললে, নিরামিষের নিকুচি করেছে।

বুদ্ধু বললে, কেন নিকুচি করেছে? নিরামিষ খাবার খারাপ নাকি?

নমিতা বললে, না খারাপ নয়। তবে শুনেছি, মাছ না পেলে গোবিন্দদা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। ছেলেমানুষ কিনা?

তারা ভারী খুশি হয়ে গল্প করতে লাগল। সবাই নমিতার মন রাখতে ব্যস্ত। প্রফেসর নিয়েছে তার সাইকেলের ভার। মানকে রাস্তার কলে গেল ফ্লাস্ক আর পেয়ালা ধোবার জন্যে। ছটু বাস্কেটটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিলে। বুদ্ধু সাইকেলের টায়ারগুলো পরীক্ষা করে দেখলে, তাদের মধ্যে যথেষ্ট হাওয়া আছে কি না! এবং নমিতা সর্বক্ষণ চঞ্চলা হরিণীর মতো নাচতে নাচতে গল্প বলে যাচ্ছে অনর্গল!

হঠাৎ সে একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রাজ্যের ছেলে আজ এখানে এসে জুটেছে কেন? এ-পাড়ায় আজ কিসের তামাশা?

প্রফেসর বললে, কেমন করে খবর পেয়ে ওরা আমাদের চোরধরা দেখতে এসেছে।

আচম্বিতে মোটর-হন বাজাতে বাজাতে ছুটে এল ঘন্টু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, চলো, চলো—জলদি! চোর আসছে!

প্রফেসর চিৎকার করে বললে, সবাই মিলে ওকে ঘিরে ফ্যালো! ওর সামনে থাকুক ছেলের পাল, ওর পিছনে থাকুক ছেলের পাল, ওর ডাইনে আর বাঁয়ে থাকুক ছেলের পাল! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও?

মুহূর্তের মধ্যে মাঠ খালি! নমিতা একেবারে একলা! সবাই তাকে এভাবে ফেলে গেল বলে অভিমানে তার ঠোঁট ফুলে উঠতে চাইলে। তারপর সে সাইকেলের উপরে উঠে পড়ে দিদিমার মতো মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, আমি এসব পছন্দ করি না—আমি এসব পছন্দ করি না তারপর সে ছেলেদের পিছনে পিছনে চালিয়ে দিলে সাইকেল।

গান্ধি টুপি পরে জটাধর হোটেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ডান দিকে ফিরে একটু এগিয়েই বউবাজারের রাস্তা ধরলে।

প্রফেসর, ঘন্টু ও গোবিন্দ ছেলেদের বিভিন্ন দলের ভিতরে চর পাঠিয়ে দিলে। মিনিটকয়েক পরেই দেখা গেল জটাধরকে চারিধার থেকে ঘিরে ফেলে মহা হট্টগোল করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে শিশুপলটনের পর শিশু-পলটন!

জটাধর চারিদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল দস্তুরমতো! ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও বকবকি করতে করতে চলেছে তার সঙ্গে-সঙ্গেই। অনেক ছেলে তার মুখের দিকে এমন কটমট করে তাকাচ্ছে যে, মহাবিব্রত হয়ে সে বুঝতেই পারলে না যে, কোন দিকে মুখ ফেরালে এইসব দৃষ্টিবাণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে! হঠাৎ সোঁ করে একটা ঢিল জটাধরের মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। ভয়ানক চমকে উঠে সে আরও তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে। কিন্তু ছেলেরাও বাড়িয়ে দিলে তাদের পায়ের গতি। ধাঁ করে সে পাশের একটা গলির ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হয়েই হতাশভাবে দেখলে, সেখান থেকেও তেড়ে আসছে নতুন শিশুপাল!

ঘন্টু বললে, জটাবেটার মুখখানা দেখ! ও যেন ক্রমাগত হাঁচতে চাইছে, কিন্তু পারছে না!

গোবিন্দ বললে, ঘণ্টু, আমাকে তোমার আড়ালে আড়ালে নিয়ে চলো! চোর যেন এখুনি আমাকে না চিনে ফেলে! এখনও দেখা দেবার সময় হয়নি?

এই অপূর্ব শোভাযাত্রার পিছনে চঞ্চল-কৌতুকে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসছে সাইকেলবাহিনী নমিতা সেন!

এইবারে জটাধরের বুক ধুকপুক করতে লাগল। সে সকল দিক থেকেই পেলে যেন একটা অদৃশ্য বিপদের গন্ধ! পা ফেলতে লাগল সে লম্বা লম্বা! কিন্তু শিশুপালকে এড়ানো অসম্ভব! হঠাৎ সে ফিরে দৌড় মারবার চেষ্টা করলে—সঙ্গে সঙ্গে মানকে ঠিক তার সামনেই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং অমনি জটাধরও দড়াম করে পপাত ধরণীতলে! জটাধর ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, ওরে খুদে বিচ্ছুর দল, মতলবখানা কী তোদের? এখান থেকে বিদায় হ, বিদায় হ, বলছি। নইলে এখুনি আমি পুলিশ ডাকব।

মানকে মুখ ভেংচে বললে, তাই ডাকো—লক্ষ্মী সোনা আমার। তুমি পুলিশ ডাকলেই আমরা খুশি হই!

পুলিশ ডাকবার ইচ্ছা জটাধরের মোটেই নেই। ভয়ে তার প্রাণ ক্রমেই কুঁকড়ে পড়ছে। সে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাস্তার লোক অবাক হয়ে গেছে—এত শিশু একসঙ্গে কেউ দেখেনি। পথের দু পাশের বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় দলে দলে কৌতুহলী মুখ! দোকানদাররা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করছে, ব্যাপার কী?—ব্যাপার কী? পথের মোড়ে মোড়ে সার্জেন্ট-পাহাড়াওয়ালারা বিস্ময়-বিস্ফোরিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে তার মুখের পানে। তারপরই একদল ছেলে এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে গান ধরলে

জটাবেটা, জটাবেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা
মাথায় গান্ধি-টুপি,

ঘরে ঢুকে চুপি-চুপি,
চুরি করে এটা-সেটা—
জটাবেটা, জটাবেটা!

ও বাবা, বলে কীগো! হতভাগারা তার নাম পর্যন্ত আদায় করেছে—তার নামে পদ্য পর্যন্ত লিখে ফেলেছে! এ যে সঙিন ব্যাপার!

তখন তারা ডালহাউসি স্কোয়ারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এসে পড়েছে।

জটাধর বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়েই দেখলে 'কারেন্সির' বাড়ি। চট করে তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধির উদয় হল। বেগে শিশু-বৃহ ভেদ করে একেবারে সে কারেন্সি-বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এক মুহূর্তে প্রফেসরও করেন্সির দরজার কাছে হাজির। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে, আমি আর ঘন্টু আগে ভেতরে যাই। আর সকলে দরজার কাছে অপেক্ষা করুক। তারপর ঘণ্টু হর্ন বাজালেই গোবিন্দ যেন বাছা বাছা দশজন ছেলে নিয়ে ভেতরে যায়!

প্রফেসর ও ঘন্টু ভেতরে ঢুকে গেল। বিপুল উত্তেজনায় গোবিন্দের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে থর থর করে। এতক্ষণ পরে একটানা-একটা কিছু হবেই। সে বুদ্ধ, ছট্টু, মানকে ও নন্দ প্রভৃতি দলের কয়েকজন মাতব্বরকে কাছে ডাকলে। বাকি সবাইকে বললে, সেখান থেকে চলে যেতে।

বাকি ছেলের দল সেখান থেকে একটু তফাতে সরে গেল মাত্র, বিদায় হবার নামও কেউ করলে না। পরিণাম না দেখে কেউ নড়তে রাজি নয়।

একটি ছেলের হাতে সাইকেলের ভার দিয়ে নমিতা এসে দাঁড়াল গোবিন্দের কাছে। বললে, গোবিন্দদা, এই আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়ালুম। ভয় পেয়ো না, ব্যাপার বড়ো বিষম। আমার বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে ঠিক ব্যাঙের মতো!

গোবিন্দ বললে, আমারও তাই!

আলপিনের মহিমা

প্রফেসর ও ঘন্টু ভিতরে ঢুকে দেখলে, জটাধর একেবারে কাউন্টারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার কর্মচারী তখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

প্রফেসর চোরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিকারির মতো তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

চোরের পিছনে দাঁড়াল ঘন্টু, মোটর-হন বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।

কর্মচারী ফোন ছেড়ে এসে প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করলে, তার কী দরকার?

চোরকে দেখিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললে, এই ভদ্রলোক আমার আগে এসেছেন।

—আপনি কী চান মশাই?

জটাধর বললে, একশো টাকার নোটের বদলে দশখানা দশ টাকার নোট চাই।

কর্মচারী নোটখানা নিলে।

প্রফেসর বললে, মশাই, একটু অপেক্ষা করুন। ওখানা চোরাই নোট।

কর্মচারী চমকে বললে, কী?

অন্যান্য কেরানি কাজ করতে করতে সবিস্ময়ে মুখ তুলে দেখলে।

প্রফেসর বললে, এই ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর পকেট থেকে ওই নোটখানা চুরি করেছে।

—কী! এত বড়ো আস্পর্ধা! আমি চোর? তবে রে ছুঁচো! বলেই জটাধর প্রফেসরের গলে সশব্দে মারলে প্রচণ্ড এক চড়!

প্রফেসর বললে, চড় মেরে তোমার কোনওই লাভ হবে না? বলেই এমন তেজে জটাধরকে আক্রমণ করলে যে, সে কোনওরকমে কাউন্টার ধরে পতন থেকে করলে আত্মরক্ষা!

কেরানিরা কাজ ফেলে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। কারেন্সির একজন বড়োকর্তা বা অফিসারও এসে হাজির!

ঘন্টু বাজালে মোটর-হন। গোবিন্দের পিছনে পিছনে হল আরও দশ শিশুমূর্তির আবির্ভাব। কী অফিসার ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, এখানে এত গোলমাল কেন? এত ছেলে কেন? ব্যাপার কী।

জটাধর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, স্যার, আমি যে একশো টাকার নোটখানা ভাঙাতে দিয়েছি, এরা বলে সেখানা নাকি চোরাই নোট।

জটাধরের সুমুখে এসে গোবিন্দ বললে, এরা কেউ মিথ্যে বলছে না। কাল কালীপুর থেকে কলকাতায় আসবার সময়ে ট্রেনে আমি ঘূমিয়ে পড়েছিলুম। সেই ফাঁকে তুমি আমার পকেট থেকে একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেছিলে!

অফিসার বললেন, ছোকরা, তোমার কথার কোনও প্রমাণ আছে?

চোর গোবিন্দকে দেখে প্রথমটা দমে গিয়েছিল। এখন নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কিছু প্রমাণ নেই স্যার! আমি আজ এক হস্তার ভেতরে কলকাতার বাইরে পা বাড়াইনি।

রাগে প্রায় কেঁদে ফেলে গোবিন্দ বললে, মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা!

জটাধর হাসতে হাসতে বললে, ট্রেনে তোমার কেউ সাক্ষী আছে?

—আছে। কালীপুরের বিষ্ণু চক্রবর্তী সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, এই লোকটি কাল ট্রেনে করে আমার সঙ্গে এসেছে।

অফিসার জটাধরকে বললেন, এ-কথার উত্তরে তোমার কী বলবার আছে?

জটাধর বললে, স্যার, আমি আদর্শ ভোজনালয়ে থাকি। আমি—

ঘণ্টু বাঁধা দিয়ে বললে, আদর্শ ভোজনালয়ে তুমি ঘর ভাড়া নিয়েছ কাল বৈকালে। হোটেলের চাকরের উর্দি পরে আমি কাল সারারাত তোমার ওপরে পাহারা দিয়েছি।

অফিসার ও কেরানিরা সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে হাসতে লাগল।

অফিসার বললেন, আপাতত এই একশো টাকার নোট ভাঙানো হতে পারে না?—বলেই তিনি নাম ও ঠিকানা নেবার জন্যে কাগজ ও কলম হাতে করলেন।

গোবিন্দ বললে, এর নাম জটাধর। চোর বললে, এরা দেখছি আমার নাম পর্যন্ত বদলে দিতে চায়। স্যার, আমার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

গোবিন্দ বললে, উঃ কী মিথ্যাবাদী! ট্রেনে তুমি আমাকে নিজে বলেছ, তোমার নাম জটাধর!

অফিসার বললেন, আপনার নাম যে অবিনাশ, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারেন?

জটাধর বললে, তাহলে আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমার কাগজ-পত্তর আছে হোটেলেই।

গোবিন্দ বললে, স্যার, ও পালাতে চায়! আপনি আমার টাকাগুলো আদায় করে দিন— আমার একশো পঁচিশ টাকা।'

অফিসার গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে বললেন, খোকাবাবু, ব্যাপারটা তুমি যতটা সহজ মনে করছ ততটা সহজ নয়! নোট যে তোমার, তার প্রমাণ কী? নোটের পিছনে তোমার নাম লেখা আছে? নোটের নম্বর তুমি বলতে পারো?

—না, তা পারি না বটে। তবু নোটগুলো আমারই। মা আমার হাত দিয়ে নোটগুলো পাঠিয়েছিলেন দিদিমার কাছে।

জটাধর বললে, স্যার, ভগবানের নাম নিয়ে বলতে পারি, ও নোট আমার। ছোটো ছোটো খোকার টাকা চুরি করা আমার ব্যাবসা নয়।

হঠাৎ গোবিন্দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎসাহভরে বললে, স্যার, একটা কথা আমার মনে পড়েছে। আমি আলপিন দিয়ে নোটসুদ্ধ একখানা খাম পকেটের সঙ্গে গেঁথে রেখেছিলুম। এই দেখুন সেই আলপিন?

জটাধর দুই পা পিছিয়ে দাঁড়াল। অফিসার একশো টাকার নোটখানা চেয়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ছেলেটি ঠিক বলেছে! নোটের পিছনে একটা বড়ো আলপিন বেঁধার দাগ রয়েছে তো বটে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই জটাধর ফিরে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে ছেলের দলকে দুদিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে মারলে দৌড়! বিদ্যুতের মতো সে একেবারে বাড়ির বাইরে!

অফিসার চিৎকার করলেন, পাকড়ো—পাকড়ো! এই সেপাই!

সকলেই বাইরে ছুটে গেল। না, চোর পালাতে পারেনি—ছেলের দল আবার তাকে ঘিরে ফেলেছে! সে মাটির উপরে পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে এবং প্রায় কুড়িজন শিশু-যোদ্ধা তার দুই হাত, দুই পা, জামা ও মাথা ধরে করছে টানাটানি জটাধর পাগলের মতো ছটফট করছে, কিন্তু ছেলেরা তার সর্বাঙ্গে লেগে আছে ছিনে-জোঁকের মতো।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং! কেউ জানে না, ইতিমধ্যে নমিতা সেন কখন গিয়েছিল পুলিশ ডাকতে। এখন দেখা গেল নমিতার সাইকেলের পিছনে পিছনে ছুটে আসছে একজন সার্জেন্ট ও একজন পাহারাওয়ালা।

কারেন্সির অফিসার বললেন, সাজেন্ট, এর নাম অবিনাশ কী জটাধর আমি তা জানি না! কিন্তু এ যে চোর, তাতে আর সন্দেহ নেই!

চোর.গ্রেপ্তার করে সার্জেন্ট চলল থানার দিকে। সে এক বিচিত্র শোভাযাত্রা! সর্বপ্রথম সার্জেন্ট ও কারেন্সির অফিসার এবং তাদের মাঝখানে জটাধর বা অবিনাশ। তারপর প্রায় দেড়শো ছেলে গাইতে গাইতে চলেছে—

জটাবেটা, জটাবেটা!

ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা?

এবং শোভাযাত্রার পাশে পাশে আসছে সাইকেল-বাহিনী কুমারী নমিতা সেন, তার ছোটো হাতের চাপে মিষ্টি ঘণ্টা বাজছে ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!

থানার সামনে এসে নমিতা বললে, 'গোবিন্দ, ভাই! আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির সবাইকে সিনেমার এই গল্পটা বলতে চললুম!

গোবিন্দ বললে, আমিও একটু পরে যাচ্ছি। আমার খাবার যেন তৈরি থাকে—কিন্তু নিরামিষ নয়, খবরদার!

নমিতা সেনের সাইকেল আবার ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করতে লাগল!

চুপ! চুপ!

থানার ইনস্পেকটার গোবিন্দকে তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলে। তারপর চোরকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কী?

চোর বললে, সুদর্শন বিশ্বাস।

গোবিন্দ, প্রফেসর ও ঘন্টু হো হো করে হেসে উঠল—এমনকী কারেন্সির সুগম্ভীর অফিসার পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলেন না।

ঘন্টু বললে, অদ্ভুত প্রথমে ওর নাম হল জটাধর। তারপর শোনা গেল—অবিনাশ দাস। এখন আবার শুনছি সুদর্শন বিশ্বাস! তাহলে ওর আসল নাম কী?

ইনস্পেকটার বিরক্ত স্বরে বললে, চুপ! ওর আসল নাম বার করতে আমাদের দেরি লাগবে না! ওরে জটাধর-অবিনাশ-সুদর্শন! থাকা হয় কোথায়?

—আপার সার্কুলার রোডের আদর্শ ভোজনালয়ে।

—ওখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে?

—চন্দননগরে?

প্রফেসর বললে, আর-একটা নতুন মিথ্যে কথা!

ইনস্পেকটার গর্জন করে বললে, চুপ! মিথ্যে কী সত্যি, জানতে আমাদের বাকি থাকবে না।

এই সময়ে করেন্সির অফিসার বিদায় নিলেন এবং যাবার সময়ে গোবিন্দের পিঠ চাপড়ে গেলেন আদর করে।

—তারপর বাপু সুদর্শন, তুমি কি গোবিন্দের একশো পচিশ টাকা চুরি করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর

—তাহলে বাকি পঁচিশ টাকা কোথায় গেল?

পকেট থেকে একখানা খাম বের করে চোর বললে, হুজুর, বাকি টাকা ওই খামের ভিতরেই আছে।

—ওইটুকু ছেলের টাকা চুরি করতে তোমার মায়া হল না?

—মনের ভুল হুজুর, গ্রহের ফের! ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছিল আর ওর পকেট থেকে টাকাগুলো বেরিয়ে গাড়ির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল। আমার পকেটে একটা আধলাও ছিল না, কাজেই আমি লোভ সামলাতে পারিনি!

প্রফেসর বললে, আবার মিথ্যে কথা স্যার! গোবিন্দের সব টাকা ও ফিরিয়ে দিয়েছে। ও বলছে ওর পকেটে আর একটা আধলাও ছিল না। অথচ হোটেল ভাড়া ও খাবারের টাকা দিয়েছে, তারপর ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছে—

ইনস্পেকটার চিৎকার করলে, চুপ! ওসব জানাও আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না বলেই এতক্ষণ যে যা বলেছে সমস্তই একে একে লিখে নিলে।

চোর বললে, হুজুর, আমি তো অপরাধ স্বীকার করেছি, এ যাত্রা আমাকে ছেড়ে দিতে হুকুম হোক।

ইনস্পেকটার বললে, চুপ! এটা তোমার মামার বাড়ি নয়, এখানে কেউ তোমার আবদার শুনবে না! সাজেন্ট, আসামিকে লক-আপে রাখবার ব্যবস্থা করো।

গোবিন্দ বললে, স্যার আমার টাকাগুলো কখন ফেরত পাব?

—পুলিশ হেড-কোয়ার্টার থেকে শীঘ্রই তোমার ডাক আসবে খোকাবাবু, টাকা ফেরত পাবে সেখান থেকেই।

গোবিন্দ বললে, স্যার, আমার নাম খোকাবাবু নয়, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়!

এতক্ষণ পরে ইনস্পেকটারের মুখে হাসি ফুটল। বললে, হ্যাঁ, গোবিন্দবাবু, তোমাকে খোকাবাবু বলে ডাকা আমার উচিত হয়নি। কারণ, তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে চোর ধরেছ, তার ভেতরে একটুও খোকাবাবুত্ব নেই। তোমরা হচ্ছ পাকা ডিটেকটিভ, তোমরা হচ্ছ বাহাদুর আচ্ছ, পরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আজ তোমরা বাড়ি যাও।

গোবিন্দ থানার বাইরে এসে দেখলে, ছেলের দল—সেই শ-দেড়েক পঙ্গপালের মতো শিশুপাল তখনও রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়নি। গাড়ি-ঘোড়া ও লোক-চলাচলের বাধা হচ্ছে বলে পাহারাওয়ালারা তাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে যথাসাধ্য! কিন্তু তাড়া খেয়ে তারা বড়েজোর হাত দশ-পনেরো সরে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র! গোবিন্দের একটা হেস্তো-নেস্তো না হলে রাস্তা থেকে তারা কিছুতেই অদৃশ্য হবে না।

গোবিন্দ তাদের সম্বোধন করে হাসতে হাসতে বললে, ভাইসব! চোর ধরা পড়েছে, আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, আর কেন তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে খেলার সময় নষ্ট করছ? তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ, কারণ, তোমরা না থাকলে জটা আজ ধরা পড়ত না। এইবার যে-যার কাজে যাও, নমস্কার!

তখন ছেলেরা দল বেঁধে আবার গাইতে গাইতে চলে গেল—

জটাবেটা, জটাবেটা!
ঘোড়ামুখো, নাদা-পেটা!

সেখানে গোবিন্দের সঙ্গে তখন রইল কেবল গোয়েন্দারা।

গোবিন্দ বললে, এর পর আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, টেলিফোনে মঙ্গলবারকে সব খবর জানানো। কারণ, খবর না পেয়ে সে হয়তো এতক্ষণ ছটফট করে সারা হচ্ছে!

নন্দ ফোন করতে ছুটল।

গোবিন্দ আর সকলের দিকে ফিরে বলল, ভাই, তোমরা আমার জন্যে অনেক ভেবেছ, অনেক খেটেছ! তার ঋণ আর এ-জীবনে শোধ হবে না! কিন্তু আমার জন্যে তোমরা যে টাকা-পয়সা খরচ করেছ, সেটা আমি যত শীঘ্র পারি শোধ করে দেব।

ঘন্টু বললে, কী! ও-খরচটাকে যদি তুমি ধার বলে মনে করো তাহলে আমরা সবাই রেগে হব টং। তারপর তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন গোবিন্দ, আর-এক বিষয়ে এখনও আমাদের হিসেব-নিকেশ হয়নি? সেই তোমার অদ্ভুত খালাসি-রঙের জামার জন্যে মুষ্টিযুদ্ধের কথা এখুনি তুমি ভুলে গেলে নাকি?

নিজের দু হাতে প্রফেসর ও ঘন্টুর হাত ধরে গোবিন্দ বললে, ভুলিনি ভাই, কিছুই ভুলিনি। আজ আমার আনন্দের দিনে তোমার মুষ্টিযুদ্ধের কথা ভুলে যাও ঘণ্টু। আজ কৃতজ্ঞতায় মন যখন ভরে উঠেছে, তখন ঘুষি মেরে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেব কেমন করে।

ঘণ্টু বললে, কৃতজ্ঞ হও, আর না হও, ঘুষি মেরে আমাকে মাটিতে ফেলে দেবার ক্ষমতা কিন্তু তোমার নেই, বুঝলে ভায়া?

খোকা-খুকিদের বন্ধু হেমেন রায়

চোর ধরা পড়ল বটে, কিন্তু এখনও আমাদের গল্প শেষ হয়নি। আর গল্পের আসল মজাটুকুই আছে শেষের দিকে।

সেদিন প্রফেসর ও ঘণ্টুকে নিয়ে গোবিন্দ আবার রাস্তায় বেরিয়েছে সেজেগুজে। কারণ, উত্তরাঞ্চলের পুলিশের ডেপুটিকমিশনার তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

ঘণ্টু আড়-চোখে লক্ষ করলে, গোবিন্দ আজ নীল রঙের পোশাক পরেনি! জোড়াবাগানে ডেপুটিকমিশনারের আস্তানা। চারিদিকে সাদামুখে সার্জেন্ট, লালপাগড়ি চৌকিদার, ব্যস্তমুখ উকিল, গম্ভীর ইনস্পেকটার আর শুকনো-চেহারা চোর-জুয়াচোর প্রভৃতির ভিড়। গোবিন্দ হতভম্ব হয়ে গেল—তার ভয়ও যে হচ্ছিল না, তা নয়!

গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বললে, কলকাতায় এত চোর-বদমাইশ আছে!

প্রফেসর বললে, এর চেয়ে ঢের-ঢের বেশি আছে গোবিন্দ। কলকাতার পথ দিয়ে রোজ যারা হাঁটে, তাদের মধ্যে সাধুর চেয়ে, পাপীই আছে বেশি। সব পাপী ধরা পড়ে না তাই তারা সাধু! আমরা না থাকলে জটাবেটাকে আজ কে চোর বলে চিনতে পারত?

গোবিন্দ বললে, ও ভাই, জটাবেটাও যে চোরদের সঙ্গে বারান্দায় বসে আছে—দ্যাখো, দ্যাখো!

জটাধর উবু হয়ে বসে আছে, তার মাথায় আজ গান্ধি-টুপি নেই!

ঘণ্টু বললে, কী গো জটাধর-অবিনাশ-সুদর্শন বাবু! তোমার সাধের গন্ধি-টুপি কে কেড়ে নিলে?

জটাধর কথা কইলে না—ঘোড়ামুখ ফিরিয়ে নিলে অন্যদিকে। বোধহয় রাজার অতিথি হতে পেরেছে বলে জাঁক হয়েছে তার মনে মনে।

এমন সময়ে গোবিন্দের ডাক এল। সে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলে, ডেপুটিকমিশনার ও আরও কয়েকজন পোশাক-পরা ভদ্রলোক সেখানে বসে রয়েছেন।

ডেপুটিকমিশনার তাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, এসো এসো,—কলকাতার সবচেয়ে বয়সে ছোটো, কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিতে বড়ো ডিটেকটিভ এসো। বোসো জটাধর, বোসো?

সে বললে, আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ!

—হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। চেয়ারে উঠে বোসো। তোমার আর তোমার বন্ধুদের আশ্চর্য কাহিনী আমি শুনেছি। বাহাদুর, বাহাদুর। হ্যাঁ, তুমি তোমার টাকাগুলো ফেরত চাও? মামলা শেষ হবার আগে আমরা টাকা ফেরত দিই না, তবে তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। এই নাও তোমার টাকা। দ্যাখো, আবার যেন হারিয়ে বোসো না।'

—আজ্ঞে, না স্যার! এ টাকা এখুনি গিয়ে আমার দিদিমার হাতে দেব!

—হ্যাঁ, তাই দিয়ো।

ঠিক সেই সময়ে তার টেবিলের উপরে টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। ডেপুটিকমিশনার রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ.বেশ তো, আপনারা এখানে এলেই তার দেখা পাবেন। এখুনি আসবেন? আচ্ছা!..হ্যাঁ, শোনো জটাধরবাবু—

—আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ।

—হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে। শোনো : তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খবরের কাগজের এক সম্পাদক আর রিপোর্টাররা এখনই এখানে আসবে?

—কেন স্যার? আমি কি কোনও অন্যায় করে ফেলেছি?

ডেপুটিকমিশনার হেসে উঠে বললেন, না, না, অন্যায় করবে কেন? রিপোর্টাররা পাহারাওয়ালা নয়, তারা তোমাকে ধরতে আসছে না, তোমাকে

কেবল গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে আসছে! বোধহয় খবরের কাগজে তোমার নাম বেরুবে!

গোবিন্দ সবিস্ময়ে বললে, খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে? কেন স্যার?

—গোয়েন্দাগিরিতে তুমি আমাদের— অর্থাৎ পুলিশের ওপরেও টেক্কা মেরেছ বলে।

–কিন্তু এ বাহাদুরি তো খালি আমার একলার নয়! আমাদের চশমা-পরা প্রফেসর, ছোকরা চাকরের উর্দি পরা ঘণ্টু ছিল, আরও ছিল মানকে, বুদ্ধু, ছট্টু, মঙ্গলবার—

ডেপুটিকমিশনার আবার হেসে বললেন, হহ্যাঁ, হ্যা, তাদেরও নাম যাতে বাদ না যায় সেচেষ্টা আমি করব জটাধর—

—আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ

—হ্যাঁ, গোবিন্দই বটে জটাধর বুঝি সেই পাঁজি চোরটার নাম? বটে? ও-নাম ধরে তোমাকে ডাকা নিশ্চয়ই উচিত নয়। আচ্ছ, আর আমি ভুলব না। ওই দাখো গোবিন্দ, রিপোর্টাররা আসছে।

চারজন ভদ্রলোক ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন। গোবিন্দের মনে হল, তাদের মধ্যে একটি রোগা রোগী লম্বা-চুল, চশমা-পরা লোকের মুখ যেন সে আগে কোথায় দেখেছে!

তাদের অনুরোধে গোবিন্দ একে একে নিজে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলে। একজন রিপোর্টার বললেন, এ যেন কেতাবী গল্প! পাড়াগেঁয়ে ছেলে একদিনে হয়ে দাঁড়াল শহরের ডিটেকটিভ। অদ্ভুত, অভাবিত!

আর-একজন জিজ্ঞাসা করলেন, গোবিন্দ, এত কাণ্ড না করে তুমি পাহারাওয়ালা ডেকে চোরকে ধরিয়ে দিলে না কেন?

গোবিন্দের মুখে হঠাৎ ভয়ের ছায়া পড়ল। তার চোখের সামনে জেগে উঠল, কালীপুরের নটবর-চৌকিদারের মুখ!

ডেপুটিকমিশনার বললেন, জবাব না দিয়ে, চুপ করে রইলে কেন গোবিন্দ?

—আজ্ঞে, ভয়ে আমি পাহারাওয়ালা ডাকিনি। কালীপুরের মুখুয্যেদের পেয়ারা গাছ থেকে আমি যখন পেয়ারা পাড়ছিলুম, তখন নটবর-চৌকিদার আমাকে দেখে ফেলেছিল?

ঘরসুদ্ধ সবাই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে ফেলে আর কি! অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে ডেপুটিকমিশনার বললেন, না গোবিন্দ, না। তোমার মতন এতবড়ো ডিটেকটিভকে নটবর-চৌকিদারের কথায় আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি কি? না, তোমার কোনও ভয় নেই!

আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বললে, গ্রেপ্তার করবেন না? আঃ, বাঁচলুম!

—তবে, ভবিষ্যতে পরের বাগানের পেয়ারা গাছের দিকে আর নজর দিয়ো না! হ্যাঁ, নজর অবশ্যি দিতে পারো, কিন্তু পেড়ে খেতে যেয়ো না।

গোবিন্দ ধীরে ধীরে সেই চশমা-পরা ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে তার মনে পড়েছে! বললে, স্যার, আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন না?

—না গোবিন্দবাবু, পারছি না তো!

—আমার কাছে পয়সা ছিল না, হ্যারিসন রোডের ট্রামে আপনি আমার ট্রাম-ভাড়া দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গোবিন্দের সঙ্গে সেক হ্যান্ড করে বললেন, ওহো তাহলে আমরা দেখছি পুরানো বন্ধু? হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমার পয়সা ফিরিয়ে দেবে বলেছিলে—

—কিন্তু আপনি নাম-ঠিকানা বললেন না!

—আজ বলতে পারি। আমার নাম—হেমেন রায়, আমি কাগজের সম্পাদক, থাকি আমি বাগবাজারের গঙ্গাতীরে!

—আজ কি ট্রাম-ভাড়ার পয়সাগুলো আমি ফিরিয়ে দিতে পারি?

—না গোবিন্দ, তা পারো না! কারণ তোমাদের পয়সাতেই তো আমি করে খাচ্ছি! আমি তো খালি খবরের কাগজে লিখি না, ছেলেদের উপন্যাসও যে লিখি। ছেলেরা আমার বই কেনে আর আমাকে ভালোবাসে বলেই তো আজ আমি বেঁচে আছি। তারপর ডেপুটিকমিশনারের দিকে ফিরে হেমেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার, এইটেই কি চোর জটাধরের প্রথম চুরি? —

না হেমেনবাবু, আমার তা মনে হয় না। জটাধরের সম্বন্ধে ক্রমেই অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ পাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরে আমাকে ফোন করলেই পাকা খবর দিতে পারব।

হেমেন রায় বললেন, গোবিন্দ, চলো আজ আমার সঙ্গে হোটেলে চলো। কিছু খাবার আর চা খেতে তোমার আপত্তি আছে কি?

—না স্যার, আপত্তি নেই। কিন্তু—

—কিন্তু, কি?

—প্রফেসর আর ঘণ্টু বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

—বেশ তো, তাদেরও নিমন্ত্রণ করছি। এখানে তোমার আর কোনও কাজ নেই তো? তবে চলো।

হেমেন রায়ের সঙ্গে গোবিন্দ, প্রফেসর ও ঘণ্টু রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ট্যাক্সি ডাকা হল। তারপর সিধে চৌরঙ্গির এক হোটেলে। (এখানে বলে রাখি, ইতিমধ্যে ট্যাক্সিতে হেমেন রায়ের পাশে বসেই ঘণ্টু তার কানের কাছে এত-জোরে ভোঁপ ভোঁপ করে মোটর-হন বাজিয়ে দিয়েছিল যে, ভদ্রলোক চমকে ও লাফিয়ে উঠে

গাড়ি থেকে পড়ে যান আর কী! তার ভয় দেখে ঘন্টুর খিলখিল করে কী হাসির ধুম।)

চৌরঙ্গির সব অট্টালিকা, মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ ও বিলাতি হোটেলের সাজসজ্জা প্রভৃতি দেখে বিস্মিত গোবিন্দের চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল!

হেমেন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে কী খাবে বলো?

প্রফেসর চশমা খুলে নাড়তে নাড়তে বললে, চপ, ফাউল-কাটলেট আর চা! ঘণ্টু বললে, ফাউল স্যান্ডউইচ, ওমলেট আর চা!— বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে বেরিয়েছে বলে তার অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল। ক্ষুধা থাকলে তার অর্ডারের ফর্দ এর চেয়ে ঢের বড়ো হত নিশ্চয়ই!

গোবিন্দ বললে, আমি তো সব খাবারের নাম জানি না, হোটেলে কখনও খাইনি। আমার যে-কোনও খাবার হলেই চলবে— কেবল ফাউল আর গোরুর মাংস খাব না স্যার!

হেমেন রায় খাবারের অর্ডার দিয়েই দেখলেন, ঘন্টু তার মোটর-হন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তিনি হর্নটি তার হাত থেকে নিজের হস্তগত করে বললেন, এটা আপাতত আমার কাছে থাক, ঘণ্টু! হোটেল থেকে বেরিয়ে আবার তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দেব? ...খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর হেমেন রায় হোটেলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার ডেপুটি কমিশনারকে ফোন করি!

ফেনের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যালো! হ্যাঁ আমি, হেমেন রায়!...কী বললেন? তাও কি সম্ভব, বলেন কী? ...এখন তার কাছে এ-খবর ভাঙব না, আচ্ছা! কাগজে এ গল্প বেরুলে আমাদের পাঠকরা যে স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

ফোন ছেড়ে ফিরে এসে হেমেন রায় এমনভাবে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন সে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক জীব! জীবনে এর আগে তিনি তাকে আর যেন কখনও দেখেননি!

বললেন, চলো গোবিন্দ, ফটোগ্রাফারের কাছে চলো। আমরা তোমার একখানা ছবি তুলব।

অত্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গোবিন্দ বললে, ছবি? আমার? কেন?

—পরে জানতে পারবে। এখন চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

যথাসময়ে গোবিন্দের ছবি তুলে নিয়ে হেমেন রায় তাকে আর তার দুই বন্ধুকে বাড়িতে পৌছে দিলেন।

গোবিন্দ গাড়ি থেকে নেমে নমস্কার করলে।

হেমেন রায় বললেন, গোবিন্দ, তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিয়ো। আর, কাল সকালে উঠে আগে খবরের কাগজ পড়তে ভুলো না।

গোবিন্দ বুঝলে, কাগজে তার নাম বেরুবে বলেই হেমেন রায় তাকে কাগজ পড়তে বলছেন। লজ্জায় মুখ নামিয়ে সে বললে, আচ্ছা স্যার।

হেমেন রায় রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, শীঘ্রই তুমি আরও একটা মস্ত সুখবর পাবে! যে-সে খবর নয়, একেবারে অবাক হয়ে যাবে গোবিন্দ! আজ আসি তা হলে—

নমিতার ‘ওরিয়েন্টাল ডান্স’

গোবিন্দ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলে, নমিতা চায়ের সরঞ্জাম-সাজানো একখানা ‘ট্রে’ হাতে নিয়ে নীচে নামবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবিন্দ উৎফুল্ল-স্বরে বললে, নমু, নমু! টাকা পেয়েছি! কী মজা!

নমিতা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে সরে গিয়ে বললে, এখানে ্রামাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না গোবিন্দদা, এখুনি হাত থেকে ‘ট্রে’ পড়ে যাবে! তুমি দিদিমার কাছে যাও, এখুনি আমি আসছি! কী করব বলো, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, সংসার নিয়ে খাটতে খাটতেই জীবনটা বয়ে গেল। বলেই খিল খিল করে কৌতুকহাসি।

দোতলার বড়ো ঘরে ঢুকেই গোবিন্দ দেখলে, তার সাড়া পেয়ে দিদিমা উৎকণ্ঠিতভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সে এক ছুটে দিদিমার কাছে গিয়ে তার হাতে নোটগুলো দিলে। দিদিমা নোটগুলো আঁচলে বেঁধে রেখে, নাতির ডান-গালে মারলেন চড় এবং বাঁ-গালে খেলেন চুমো...তারপর কি মনে করে আঁচল খুলে একখানা নোট বার করে নিয়ে বললেন, গোবু!

—দিদিম!

—এ নোটখানা তোর।

—আমি নেব না।

—ইস, নিবি না বইকী! নিতেই হবে, এটা হচ্ছে তোর বকশিশ, তুই মস্ত-বড়ো টিকটিকি হয়েছিস কিনা। (দিদিমা ডিটেকটিভকে বলেন, টিকটিকি)

এমন সময় নমিতা এসে বললে, নিয়ে নাও গোবিন্দদা। ব্যাটাছেলেরা ভারী হাঁদা! আমি হলে কারুকে দুবার সাধতে হত না?

—না, নেব না।

দিদিমা বললেন, তোকে নিতেই হবে! না নিলে দেখবি আমি এমন রেগে যাব যে, এখুনি হি হি করে বাত-জুর তেড়ে আসবে।

নমিতা বললে, চটপট নাও গোবিন্দদা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

—বেশ দিদিমা, তাহলে দাও।

গোবিদের মসিমা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তিনি বললেন, নোটখানা নিয়ে কী করবে গোবিন্দ?

—তুমিই বলো না মাসিমা, আমার কী করা উচিত?

—আমি তো বলি বাছা, তোমার যেসব নতুন বন্ধুর জন্যে টাকাগুলো ফিরে পেয়েছ, তাদের একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াও-দাওয়াও?

গোবিন্দ মাসিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি আমার মনের কথা টেনে বলেছ মাসিমা! আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলুম।

নমিতা আহ্লাদে এক পায়ে নাচতে নাচতে গানের সুরে বলল, চা তৈরী করব কিন্তু আমি— চা তৈরি করব কিন্তু আমি।

দিদিমা বললেন, আহা। সব সোনার চাদ ছেলে! বেঁচে থাক, সুখে থাক, রাঙা বউ হোক।

সেইদিন বিকালবেলায় বাড়ির সুমুখের পথে নমিতা হাছ-কোমর বেঁধে গোবিন্দকে শিখিয়ে দিচ্ছিল, কেমন করে সাইকেল চড়তে হয়।

সাইকেল চালাতে গিয়ে গোবিন্দ যখন উপরি উপরি তিনবার আছাড় খেলে, নমিতা তখন বললে, নামো মশাই, নামো। তুমি যে পারবে না তা আমি আগে থাকতেই জানি! ব্যাটাছেলেরা যা বোকা।

এমন সময়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে একজন ইনস্পেকটারের ইউনিফর্ম-পরা ভদ্রলোক নমিতাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, এই তো দেখছি ১০ নম্বর বাড়ি! হ্যাঁ খুকি, এইটে কি চন্দ্রমোহন সেনের বাড়ি?

নমিতা তার কাছে গিয়ে বললে, আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন আমি আর খুকিটি নই? আমার নাম কুমারী নমিতা সেন, চন্দ্রবাবু আমার বাবা হন।

আমার পক্ষে অন্যায় হয়ে গেছে! কিন্তু, তোমার বাবা কি বাড়িতে আছেন?

—হু-উ-উ।

—'তাঁকে একবার ডেকে দাও। তার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।

গোবিন্দচন্দ্র রায় নামে যে ছেলেটি এ-বাড়িতে থাকে, তাকেও একবার ডেকে আনো।

পুলিশ দেখে গোবিন্দ তখন পায়ে পায়ে পিছিয়ে পড়ছিল—নটবর-চৌকিদারের বিভীষিক তখনও তার মন থেকে বিলুপ্ত হয়নি! তার উপরে পুলিশের মুখে আবার নিজের নাম শুনে, ভয়ে তার প্রাণ যেন উড়ে গেল।

নমিতা বললে, ও গোবিন্দদা, তোমায় যে ইনি ডাকছেন শুনতে পাচ্ছ না?

গোবিন্দ আমতা আমতা করে বললে, 'হ্যাঁ স্যার,— আমি কি কোনও ...দোষ করেছি?

ইনস্পেকটার আশ্বাস দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, না গোবিন্দ, কোনও ভয় নেই! তোমার কপাল খুব ভালো।

গোবিন্দ তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

চন্দ্রবাবু নেমে এসে ইনস্পেকটারকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। পাহারাওয়ালার হাত থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে ইনস্পেকটার বললেন, চন্দ্রবাবু, আপনাদের গোবিন্দ যে চোরটাকে ধরেছে, সে হচ্ছে একজন সাংঘাতিক লোক। ছমাস আগে কলকাতার একটি বিখ্যাত ব্যাংক থেকে সে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার টাকা চুরি করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। পুলিশ কিছুতেই তার খোঁজ পাচ্ছিল না। এতদিন পরে সে ধরা পড়ল। তার জিনিসপত্র খানাতল্লাশ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি।

নমিতা গালে হাত দিয়ে বললে, ওমা!

—তিন মাস আগে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, যে এই চোরকে ধরে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। গোবিন্দ, চোর ধরেছ তুমি, সুতরাং ব্যাংক থেকে তোমার নামেই পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক এসেছিল। ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে সেই চেক-ভাঙনি টাকা আমি তোমাকে দিতে এসেছি। চন্দ্রবাবু, আপনি গোবিন্দের হয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে একখানা রসিদ লিখে দিন।

দিদিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমার এ-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না— আমার একথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

দিদিমা নোট ফেলে দুই হাত দিয়ে গোবিন্দকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলেন— গোবিন্দ তখন একবারে নির্বাক, তার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরছে আনন্দের অশ্রু। নমিতা তখন দুই হাতে ঢেউ খেলিয়ে ও পায়ের তালে ঘর কঁপিয়ে রীতিমতো 'ওরিয়েন্টাল ডান্স' শুরু করে দিয়েছে!

হঠাৎ গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দিদিমা! মাসিমা! কালীপুরে টেলিগ্রাম করে দাও, মা যেন নিশ্চয়ই কাল কলকাতায় চলে আসেন!

খোকনের ছবি

পরের দিন দুপুরবেলা। চলো, আমরা কালীপুরে যাই।

গোবিন্দেরই মুখে শুনেছ, সেখানে বড়ো বড়ো বাড়িও নেই, রকমারি গাড়িও নেই, হট্টগোল বা ভিড়ের হুড়োহুড়িও নেই।

আম-জাম-কাটাল বন, নরম সবুজপাতার কোলজোড়া দোয়েল শ্যামাদের চপল হাসির তান আর ঘুঘুদের মধুর অশ্রুগান; এবং বালি-মাটির বিছানায় প্রায়-ঘুমিয়ে-পড়া ছোটো নদী খঞ্জনার তন্দ্রামাখা স্বপ্নসুর!

আজ সদ্যগত বর্ষাজলে স্নান সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্যামলতা পোয়াচ্ছে শরতের সোনালি রোদ। ও-পাড়ার চৌধুরিবাড়ি থেকে ভেসে আসছে মহালয়ার প্রথম সানইয়ের মূর্ছনায় মা-দুর্গার আগমন গীতি।

প্রতিদিনকার মতো আজও কমলা সেলাইয়ের কল চালাতে চালাতে সেই গান শুনছেন আর তার প্রাণের ভিতরটা করে উঠছে হুহু হুহু। আনন্দের দিনেই আমাদের সানাই বাজে বটে, কিন্তু যাদের ভালোবাসি, তারা কাছে না থাকলে তার সুর যেন জাগিয়ে তোলে বুক-চাপা কান্নার স্মৃতি!

বিধবা কমলা, তার একমাত্র সন্তান গোবিন্দ। পুজোর দিনে আমোদে থাকবে বলে তাকে তিনি নিজেই একরকমোজর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন বটে কলকাতায়, মাসির বাড়িতে; কিন্তু আজ সানাইয়ের সুর শুনে মনটা তার কেমন ছমছম করতে লাগল। তিনি জানেন, সে পরম সুখেই আছে, তবু আজ শারদীয় উৎসবের দিনে তাকে কাছে না পেয়ে তার বুকের ভেতরটা যেন খালি খালি মনে হচ্ছে; কমলার দুই চোখ ভরে এল অশ্রুর উচ্ছাস, তার সেলাইয়ের কল হয়ে গেল বন্ধ!

ঠিক সেই সময়েই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন নিস্তারিণী ঠাকরুন। রোজই এই সময়ে একবার করে কমলার কাছে না এলে তার পেটের ভাত হজম

হয় না। সকালে-বিকালে ও মাঝে মাঝে আসেন কিংবা আসেন না, কিন্তু দুপুরবেলায় তার নিয়মিত আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কারণ দুজনে বড়ো ভাব।

নিস্তারিণী বললেন, ও বোন, সেলাইয়ের কলের সামনে বসে জানলার দিকে অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছ কেন? অসুখ করেছে নাকি?

কমলা মৃদু হেসে বললেন, না দিদি, অসুখ করেনি। খোকনকে অত করে বলে দিলুম, কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখে একটা খবর দিতে, কিন্তু সে তার গরিব মাকে একেবারেই ভুলে গেছে। বসে বসে তার কথাই ভাবছিলুম।

নিস্তরিণী মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়ে বললেন, কিছু ভাবিসনে বোন, কিছু ভাবিসনে! আমি তোর গোবিন্দের খবর দিতে পারি।

কমলা চমকে উঠে বললেন, খোকনের খবর তুমি দিতে পারে! সে কী? কেমন করে জানলে দিদি?

—আমার নব (নব হচ্ছে নিস্তারিণীর বড়োছেলে) আজ কলকাতা থেকে পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছে কিনা, তার মুখেই তোর গোবিন্দের খবর পেলুম।

—নবর সঙ্গে কি খোকনের দেকা হয়েছে?

—না বোন, খবরের কাগজে সে গোবির কথা পড়েছে!

কমলা উদ্ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, খবরের কাগজে! খবরের কাগজে খোকনের কথা! দিদি, দিদি, শিগগির বলো খোকনের কী হয়েছে? কোথায় সে? তুমি জানো? কী তুমি শুনেছ?

নিস্তারিণী হেসে বললেন, ঠান্ডা হয়ে বোস কমলা! খবরের কাগজ কেবল খারাপ খবরই দেয় না, আর খারাপ খবর হলে আমি তোর কাছে বলতে আসতুম না! আমি তো তোর শত্রু নই বোন! গোবিন্দ ভালোই আছে।'

কমলা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে আবার বসে পড়লেন। কিন্তু তবু তার বুকের ধুকপুকুনি ঘুচল না। বললেন, খবরের কাগজে খোকনের কথা কী লিখেছে দিদি?

—গোবিন নাকি একটা মস্ত-বড়ো চোরকে ধরেছে। সে চোরটা রেলগাড়িতে কেবল গোবিন্দেরই পকেট থেকে একশো পঁচিশ টাকা চুরি করেনি, কোন ব্যাংক থেকে নাকি পাঁচ লাখ টাকা চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল (তোমরা বুঝতেই পারছ, পঞ্চান্ন হাজার লোকের মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে পাঁচ লক্ষে), তোমার গোবিন্দ বুদ্ধি খেলিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে! তাই পুলিশের কাছ থেকে গোবিন্দ বকশিশ পেয়েছে পাঁচ হাজার টাকা! বুঝলে বোন? এ কি খারাপ খবর?

কমলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, না দিদি, এটা খুব ভালো খবরও নয়! একটা চোর ধরে খোকন পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে চোর ধরতে বলেছিল? এই রকম সব বোকামি করাই তার স্বভাব, সেই জন্যেই তো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!

—কিন্তু ভেবে দেখ বোন, একটা চোর ধরে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া কি চারটি-খানিক কথা! পাঁচ হাজার টা—কা!

কমলা এইবারে একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, দিদি আমার কাছে বার-বার তুমি ওই পাঁচ হাজার টাকার কথা তুলো না। আমার খোকনের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি?

—পাঁচ হাজার টাকা তো খুব বেশি টাকা বোন, লোকে এক হাজার টাকা পাবার জন্যেই মাথা খুঁড়ে মরে?

—যারা মরে তারা মরুক! আমার কাছে টাকা আগে, না খোকন আগে? চোর যদি খোকনের বুকে ছুরি বসিয়ে দিত? চোর কী না পারে? মাগো, ভাবতেও প্রাণ আমার কেঁপে উঠছে!

—'ছিছি, অমন অলক্ষুণে কথা ভাবিসনে বোন, ভাবিসনে! গোবিন মস্ত বাহাদুরি করেছে বলেই ছাপার হরফে তার নাম উঠেছে!

কমলা মাথা নেড়ে বললেন, খোকন আমার কোলেই লুকিয়ে থাকুক দিদি, ছাপার হরপে আমি তার নাম দেখতে চাই না। আজকেই আমি কলকাতায় যাব, খোকনের কাছে না গেলে প্রাণে আমি আর শান্তি পাব না?

ঠিক সেই সময়েই বাইরে সদর-দরজার কাছ থেকে শোনা গেল—টেলিগ্রাম। কমলাদেবীর নামে টেলিগ্রাম।

তোমরা বুঝতেই পারছ, এ টেলিগ্রাম কলকাতা থেকে, কমলাকে যাবার জন্যে জরুরি অনুরোধ বহন করে এনেছে।

সেই দিনেই কমলা কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু রেলগাড়িতে তাঁর জেন্য অপেক্ষা করছিল আরও বড়ো বিস্ময়।

কলকাতায় গিয়ে না পৌছানো পর্যন্ত কমলার বুক ছাৎ ছাৎ করা বন্ধ হবে বলে মনে হয় না। থেকে থেকে তার মনে হচ্ছিল, রেলগাড়িগুলো তাকে জব্দ করবার জন্যে যেন ষড়যন্ত্র করেই যথেষ্ট তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছে না—যেন তিনি নীচে নামলে গাড়িকে ঠেলে এর-চেয়ে শীঘ্র দৌড়ে নিয়ে যেতে পারেন।

গাড়ির দু-পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের যেসব থাম বোঁ বোঁ করে ছুটে চলে যাচ্ছে, কমলা খানিকক্ষণ ধরে সেইগুলো গুনতে লাগলেন। তারপর গুনতে আর ভালো লাগল না, তিনি গাড়ির ভিতর দিকে ফিরে বসলেন।

ঠিক সুমুখের বেঞ্চিতে একটি বুড়ো ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ দুহাতে বিছিয়ে ধরে আগ্রহভরে কী পাঠ করছিলেন!

হঠাৎ কমলার চোখ পড়ল কাগজের উপরে। তার পরেই স্যাৎ করে হাত চালিয়ে ফস করে, তিনি কাগজখানা কেড়ে নিলেন ভদ্রলোকের হাত থেকে!

বৃদ্ধ ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি কোনও পাগলির খপ্পরে পড়েছেন—তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিষম আতঙ্কের চিহ্ন। চলন্ত ট্রেনে পাগল বা পাগলির সঙ্গে এক কামরায় থাকা বড়ো সোজা কথা নয়।

তোতলার মতন থেমে থেমে তিনি বললেন, কী কী কী বাছা? কী চাও?

খবরের কাগজের মাঝখানে একখানা ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কমলা উত্তেজিত স্বরে বললেন, এ যে আমার খোকনের ছবি?

—খোকন? ও, বুঝেছি। ভদ্রলোক আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাহলে আপনিই হচ্ছেন মাস্টার গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মা? সোনার টুকরো ছেলে! অমন ছেলের মা হওয়াও ভাগ্যের কথা!

কমলা বললেন, আপনার মতো আর সকলেও খোকনকে বোধহয় আকাশে তুলছে! ভাগ্য! অমন ভাগ্য আমি চাই না! গজ গজ করতে করতে তিনি খবরের কাগজখানা পড়তে শুরু করে দিলেন।

গোড়াতেই বড়ো বড়ো হরফে শিরোনামা

খোকা-ডিটেকটিভের কীর্তি!!!
দেড়শো খোকার কাণ্ড!!

তারপর গেবিন্দ কালীপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেসব ঘটনার পর ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তারই উজ্জ্বল বর্ণনা!

কমলার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তার হাতের কাগজখানা কাঁপতে লাগল থর থর করে!

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, সঙ্গে কেউ না থাকলেই খোকন এমনি সব কাণ্ড করে বসে। আমি এমন পই পই করে বলে দিলুম টাকাগুলো সাবধানে রাখতে! তা সে কিনা অম্লানবদনে ঘুমিয়ে পড়ল। অত টাকা হারালে আমার কী দশা হত। বৃদ্ধ বললেন, মা, আপনি মিছেই ছেলেকে দোষ দিচ্ছেন। কে বলতে পারে, চোর তাকে চকোলেটের সঙ্গে ঘুমপাড়ানি ওষুধ

খেতে দিয়েছিল কি না! এমন তো হামেশাই হয়। কিন্তু ওই খোকার দল চোর ধরবার যে কায়দা দেখিয়েছে আশ্চর্য, তা আশ্চর্য!

ছেলের গৌরবে গর্বিত স্বরে কমলা বললেন, হ্যাঁ এ-কথা মানি। চালাক ছেলে বটে আমার খোকন। ইশকুলে কী লেখাপড়ায়, কী খেলাধুলোয় তার চেয়ে ভালো ছেলে আর নেই। কিন্তু কী দরকার বাপু চোর-ধরায়? ভেবে দেখুন তো, যদি কোনও বিপদ আপদ হত? আমার খোকন যে বেঁচেছে, এই ঢের! সে যদি আবার কখনও একলা রেলগাড়িতে চড়ে, তাহলে ভয়েই আমি মারা পড়ব। আর কখনও তাকে একলা ছাড়ব না?

বৃদ্ধ বললেন, কাগজে তার ছবি কি ঠিক উঠেছে?

—হ্যাঁ, খোকনকে ঠিক এমনটি দেখতে। সে কি বেশ সুশ্রী নয়!

—সুন্দর চেহারা।

—কিন্তু তার জামার ছিরি দেখুন একবার! লণ্ডভণ্ড, ভাঁজ-পড়া! জামা-কাপড়ের দিকে তার একেবারেই নজর নেই!

—এই যদি তার একমাত্র দোষ হয়—

বাঁধা দিয়ে কমলা বললেন, না, না! তা যদি বলেন তবে সত্যি কথা বলতে কী, খোকনের কোনও দোষই আমি দেখতে পাই না! এমন ছেলে কি হয়!

কাগজখানি কমলাকেই সমর্পণ করে বুড়ো ভদ্রলোকটি পরের স্টেশনে নেমে গেলেন। কমলা বার বার পড়তে লাগলেন তার খোকনের কীর্তি-কাহিনী। যত বার পড়েন, আবার পড়তে সাধ হয়। ট্রেন যখন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে থামল কাগজখানি তখন তিনি পড়ে ফেলেছেন এগারো বার!

স্টেশনে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল গোবিন্দ। সে দৌড়ে গিয়ে দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে সগর্বে বললে, মা, তোমার হাতেও যে কাগজ দেখছি! তাহলে জেনেছ?

দুইহাতে গোবিন্দের দুই গল টিপে ধরে কমলা বললেন, ও দেমাক যে আর ধরছে না!

—মাগো, মা! তোমাকে পেয়ে আমার যে কী আহ্লাদ হচ্ছে!

—চোর ধরতে গিয়ে পোশাকের যা দশা করেছ!

মা খুশি হবেন বলে গোবিন্দ তার নীলরঙের পোশাক পরেই স্টেশনে গিয়েছিল। এ পোশাকটি কমলার ভারী পছন্দসই।

সে বললে, ভাবছ কেন মা, আমি না হয় এবার আনকোরা নতুন পোশাক পরব।

—কে দেবে শুনি?

—একজন দোকানদার।

—হ্যাঁ মা, দোকানদার। তার পোশাকের দোকান। সে আমাকে, প্রফেসরকে আর ঘণ্টুকে এক এক সুট পোশাক উপহার দিতে চায়। তারপর নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে—বালকগোয়েন্দারা কেবল আমাদের দোকান থেকেই পোশাক কেনে। তার বিশ্বাস তাহলে দেশের সব ছেলেই ওই দোকানের পোশাক কেনবার জন্যে আবদার ধরবে। আজকাল আমরা খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছি কিনা! বুঝেছ মা?

—বুঝেছি বাছা, বুঝেছি।

—কিন্তু আমরা স্থির করেছি, ও-উপহার নেব না। আমাদের নাম নিয়ে এত হই-চই আমরা পছন্দ করি না। বুড়ো বুড়ো লোকেরা এসব ব্যাপারে বোকামি করতে পারে, কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ হলেও তাদের মতন বোকা নই!

—বাপ রে, কী বুদ্ধিমান?

—এইবারে আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে চলো।

—তারা আবার কোথায় রে?

—'আজ তুমি আসবে বলে মাসির বাড়িতে তাদের নেমন্তন্ন করেছি। চলো।

বোনের বাড়িতে ঢুকে কমলার মনে হল, সেখানে যেন হুলুস্থূল কাণ্ড উপস্থিত।

খাবারের ঘরটার ভিতরে পিল পিল করছে ছেলের পার। কোন হো হো করে হাসছে, কেউ চোঁ চোঁ শব্দে চায়ে চুমুক মারছে, কেউ সশব্দে ডিস ভেঙে ফেলছে, কেউ টেবিল চাপড়ে, কেউ হাততালি দিয়ে এবং কেউ বা পিরিচে পেয়ালা ঠুকে বাদ্যধ্বনি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে! কেউ ধূপ-ধাপ লাফাচ্ছে—সে নাকি নৃত্য। কেউ প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে—সে নাকি গান! কেউ ক্রমাগত ডিগবাজি খাচ্ছে—সে নাকি আনন্দের চূড়ান্ত!

এবং তারই ভিতর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ছুটোছুটি করছে কুমারী নমিতা সেন, হাতে নিয়ে টাটকা কেকের ডালা।

নমিতার মা হাসিমুখে টেবিলের উপরে সাজিয়ে দিচ্ছেন ফলের থালা।

এক কোণে সোফায় বসে দিদিমা—তাঁর ফোকলা মুখে হাসির বাহার। কিন্তু ফোকলা হলে কী হয়, দিদিমার বয়স যেন আজ দশ বছর কমে গেছে।

আর ঘন্টুর মোটর-হর্ন তোমরা কেউ যেন ভেব না, আজকের দিনে সে বোবা হয়ে আছে।

নমস্কার,কুশল প্রশ্ন, আলাপ-অভ্যর্থনা এবং তারপর ভোজ ও গোলমালের পালা শেষ হল।

তারপর দিদিমা তাঁর সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন, শোনো নাতির দল! এইবারে আমি দুটাে কথা বলব। ভেব না, তোমরা ভারী চালাক। সবাই আহা-মরি করে তোমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের বাহবা দেব না— আমি তোমাদের বাহবা দেব না।

ছেলের দল এক্কেবারে চুপ। এমনকী ঘন্টু পর্যন্ত তার মোটর-হর্ন লুকিয়ে ফেললে। শোনো। দেড়শো ছেলে মিলে একটা চোরকে তাড়া করে ধরতে পারা আমি মস্ত কীর্তি বলে মনে করি না। শুনে কি নাতিদের রাগ হচ্ছে? কিন্তু তোমাদের দলে এমন একজন আছে, যে অনায়াসেই এই মজার চোর-ধরা খেলায় যোগ দিয়ে তোমাদের মতোই নাম কিনতে পারত। চাকরের উর্দি পরে সে-ও নিতে পারত বাহাদুরি। কিন্তু সে তা না করে বাড়ির ভিতর চুপ করে বসেছিল—তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছিল বলে।'

সবাই খুদে মঙ্গলের দিকে ফিরে তাকাল—লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠল তার ছোট্ট মুখখানি।

—হ্যাঁ, আমি মঙ্গলের কথাই বলছি। পুরো দুদিন ঘরের কোণে টেলিফোন ছেড়ে সে নড়তে পারেনি। কারণ সে জানত, তার কর্তব্য কী? এ কর্তব্যে মজা নেই, তবু কর্তব্য হচ্ছে কর্তব্য! আশ্চর্য তার কর্তব্যপরায়ণতা, আশ্চর্য। মঙ্গল তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সেইই হচ্ছে আসল বাহাদুর।

সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, জয় মঙ্গলবারের জয়! হুররে! হুররে! হুররে!:

এ গল্পের আসল কথা কী

রাত্রিবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মাঝের-ঘরে এসে বসেছে। প্রফেসর ও তার দলবল তখন বিদায় নিয়েছে।

গোবিদের মেসো চন্দবাবু লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট বার করে কমলার হাতে দিয়ে বললেন, টাকাগুলো গোবিন্দের নামে ব্যাংকে জমা রেখো।

কমলা বললেন, তাই রাখব।

গোবিন্দ বললে, "উঁহু, আগে মায়ের জন্যে একটি ভালো সেলাইয়ের কল আর একখানি দামি কাশ্মীরি শাল কিনতে হবে। টাকা যখন আমার, তখন টাকা নিয়ে আমি যা খুশি করব।

চন্দ্রবাবু বললেন, না, তা তুমি পারো না। তুমি ছেলেমানুষ। তোমার মা যা বলবেন তাই হবে।

বাবার দিকে চোখ রাঙিয়ে চেয়ে নমিতা বললে, বা-রে! মাকে উপহার দিতে পারলে গোবিন্দদা কত খুশি হবে এটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন বাবা? বড়োরা ভারী অবুঝ তো।

দিদিমা বললেন, ঠিক কথা। কমলাকে নতুন সেলাইয়ের কল আর শাল কিনে দেওয়া মন্দ নয়। কিন্তু বাকি সব টাকা ব্যাংকে জমা থাকবে, না গোবিন্দ?

—তা থাক। কী বলো মা?

কমলা বললেন, হ্যাঁ গো আমার বড়োলোক ছেলে! যা ধরেছ, ছাড়বে না তো।

গোবিন্দ বললে, তাহলে কাল সকালেই আমরা বাজারে বেরুব। নমু, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো?

নমিতা বললে, তুমি কি ভাবছ তোমরা বাজারে বেড়াতে বেরুবে, আমি একলা ঘরে বসে বসে মশা মারব কি মাছি ধরব? হ্যাঁ, আমিও যাব। আর শোনো গো মাসি, গোবিন্দদাকে একখানা সাইকেলও কিনে দিয়ো, নইলে ও আমার সাইকেলখানা ভেঙে গুড়ো না করে ছাড়বে না।

কমলা ব্যস্তভাবে বললেন, খোকন, তুমি কি নমুর সাইকেলের কোনও ক্ষতি করেছ?

গোবিন্দ বললে, না মা, ও বাঁদরির বাজে কথা শোনো কেন?

নমিতা ভুরু-কুঁচকে বললে, আমি বাঁদরি, না তুমি বাঁদর। এ জেন্মর মতো তোমাতে আমাতে হাত দাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার দস্তুরমতো আড়ি। এ-জন্মের মতো তোমাতে-আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে, বুঝলে।

গোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে দু দিকের পকেটে দুই হাত পুরে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, কী বলব নমি, একে তুই মেয়েমানুষ-তায় রোগা-টিকটিকি! নইলে তোর সঙ্গে আজ আমি ঘুষি লড়তুম! যাক, আজকের দিনে আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজি নই। টাকা আমার, আমি সাইকেল কিনি আর না কিনি তা নিয়ে অন্য কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

দিদিমা বললেন, ঝগড়া করিসনে—ঝগড়া করিসনে, তার চেয়ে দুজনেই দুজনের চোখ খুবলে নে।

তারপর আবার এ-কয়দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। মাসি বিমলা বললেন, দিদি, তুমি তো কেবল মন্দ দিকটাই দেখছ। এ-ব্যাপারে ভালো দিকও কি নেই?

গোবিন্দ বললে, অবশ্যই আছে মাসিমা। আমি কি শিক্ষা পেয়েছি জানো?—কখনও কারুকে বিশ্বাস কোরো না।

কমলা বললেন, আমিও একটা শিক্ষা পেয়েছি। শিশুদের একলা বেড়াতে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

দিদিমা ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, বাজে কথা আমি পছন্দ করি না—বাজে কথা আমি পছন্দ করি না।

চেয়ারের উপর ঘোড়ার মতো বসে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে নমিতা গানের সুরে বললে, বাজে কথা—বাজে কথা—বাজে কথা।

বিমলা বললেন, হ্যাঁ মা, তুমি কি বলতে চাও, এ-ব্যাপারে শেখবার কিছুই নেই?

—নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই আছে।

সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কী, কী?

দিদিমা ডান হাতের তজনী তুলে বললেন, টাকা সর্বদাই পাঠাবে মনি-অর্ডার করে।

চেয়ার-ঘোড়ায় চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নমিতা বলে উঠল, ‘জয় মনি অর্ডারের জয়।’